বলেন, 'আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে . . . . কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না।'

দেশকে মাতৃজ্ঞানে মর্যাদা দিয়ে বিবেকানন্দ যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে একদিকে ছিল অন্ধ পরাণুকরণ বর্জন এবং অপরদিকে ছিল নিজ জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের চেষ্টাও উদ্যম। তিনি বলেন, 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরাণুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাস-সুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘণ্য নিষ্ঠুরতা-এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে ?' বর্তমান ভারত প্রবন্ধে তিনি বলেছে, 'শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি ?' বিজাতীয় অনুকরণের পরিবর্তে তিনি দেশবাসীকে নিজ দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশের পথে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন।

৩৮.২.১ জাতি, ব্যক্তি ও জাতীয়তা

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার তৃতীয় খন্ডে দেখা যায় যে বিবেকানন্দ জাতিকে 'ব্যস্টির সমষ্টি' বলে বর্ণণা করেছেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক মানুষের যেমন ব্যক্তিত্ব আছে, প্রত্যেক জাতিরও সেইরূপ একটি ব্যক্তিত্ব আছে। বাণী ও রচনার পঞ্চম খন্ডে তাঁর বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায় যে যেমন এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তি থেকে কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেইরূপ এক জাতিরও অপর জাতি থেকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণগত প্রভেদ আছে। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়, তেমনই প্রত্যেক জাতিরই জগতে কিছু বার্তা ঘোষণা করার আছে। ভারতের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'রাজনীতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে – কখনও ছিলও না, আর জানিয়া রাখুন, কখনও হইবে না। তবে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্য উদ্দেশ্য আছে। তাহা এই : সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি সংহত করিয়া যেন এক বিদ্যুতাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করা।'

এই আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় জনজীবনের বন্ধুসূত্র। অদ্বৈত দর্শন ও বেদান্তে বিশ্বাসী বিবেকানন্দ সর্বমানবের মধ্যে দেখেছেন ব্রহ্মের প্রকাশ। এই উপলব্ধি থেকেই তাঁর সর্বজনীন মানবতাবোধ। এই সর্বজনীন মানবতাবোধের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সকল প্রকার সংকীর্ণতার ঊর্দ্ধে উঠে বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে তিনি দেশবাসীর প্রতি জানিয়েছেন তাঁর উদাও আহ্বান, 'হে ভারত ভুলিও না-নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল-আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল-মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল-ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ . . . . . ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।'

৩৮.২.২ জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

বিবেকানন্দ দেশবাসীকে স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবোধ কখনই অন্ধ স্বজাতি বাৎসল্য ছিল না। তাঁর জাতীয়তাবাদ ছিল মুক্ত এবং উদার প্রকৃতির। বিবেকানন্দ মনে প্রাণে দেশপ্রেমিক হলেও বিজাতি বিদ্বেষ পোষণ করেন নি। তিনি কখনই এ কথা মনে করেন নি যে পাশ্চাত্ত্য জগৎ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বা গ্রহণীয় কিছুই নেই। বর্তমান ভারত প্রবন্ধে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই?' তিনি স্পষ্টই বলেন যে আমরা সম্পূর্ণ নই এবং আমাদের সমাজ সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র নয়। সুতরাং আমাদের শেখার অনেক আছে এবং সে জন্য আমাদের অবশ্যই যত্নশীল হতে হবে। পশ্চিমী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দিকগুলি যেমন বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার আদর্শকে তিনি ভারতীয় জনজীবনে গ্রহণের কথা বলেছেন।

বস্তুতঃপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আদর্শের পূজারী। প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আদর্শ অনুযায়ী প্রতিটি জাতি অন্য জাতির গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে তাকে নিজের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারে। তবে প্রতিটি জাতিই নিজস্ব মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং এই বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রাখতে যত্নশীল হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রকৃত জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছিল আন্তর্জাতিকতার আদর্শের অনুসারী। বৈদান্তিক বিবেকানন্দের সুগভীর মানবতাবোধ কেবল মাত্র স্বদেশের সীমার মধ্যে গন্ডীবদ্ধ থাকে নি। তাঁর মানবতাবোধ ছিল বিশ্বজনীন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই বিশ্বজনীন মানবতাবোধ জাগ্রত হলে গড়ে উঠবে বিশ্বচেতনার অনুভূতি। এই বিশ্বচেতনার অনুভূতিই হল আন্তর্জাতিকতার মূলমন্ত্র। বাণী ও রচনার দ্বিতীয় খন্ডে তিনি বলেছেন, ''ক্রমশঃ জাতিতে মিলন হইতেছে – আমার নিশ্চয় ধারণা, এমন একদিন আসিবে, যখন জাতি বলিয়া কিছু থাকিবে না - জাতিতে জাতিতে প্রভেদ চলিয়া যাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে''। বিবেকানন্দের আন্তর্জাতিকতার ধারণার মূলেও ছিল তাঁর অদ্বৈত-বেদান্ত দর্শন। তিনি বলেন, ''সর্বপ্রাণীর একত্ব বেদান্তের একটি প্রধান বিষয়। অজ্ঞান আর কিছু নায়, বহুত্বের ধারণা। . . . . যদি ভিতরে প্রবেশ করো তবে এই একত্ব দেখতে পাবে - মানুষে মানুষে একত্ব, উচ্চ-নীচে একত্ব, ধণী দরিদ্রে একত্ব, দেবতা মনুষ্যে একত্ব।''

৩৮.৩ সামাজিক ন্যায়

অদ্বৈত দর্শন ও ব্যবহারিক বেদান্তের প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যেই দেখেছেন দেবতাকে। সকল প্রকার অন্যায়ের শোষণশৃংখল থেকে মুক্ত করে মানুষকেতার মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। সত্যদ্রষ্টা চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে বৈষম্যযুক্ত সমাজব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কল্পনা এক স্বপ্নমাত্র। নিপীড়িত মানুষেব মুক্তির একমাত্র পথ হল সমাজের

বুক থেকে সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটানো এবং একমাত্র এইরূপে শোষণহীন সমাজেই ন্যায়বিচারের আদর্শের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব। এই শোষণমুক্ত, ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনীতিক ধ্যান ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ সাধারণ মানুষকেই রাষ্ট্রশক্তির আধার বলে মনে করতেন। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের সাধারণ মানুষের শোষণ ও অবহেলার চিত্রটি তুলে ধরেছেন। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যকে অনুসরণ করে বলা যায় যে পুরোহিত প্রাধান্যকালে রাজা রাজ্যরক্ষা, নিজেদের বিলাস, বন্ধুদের পুষ্টি এবং পুরোহিত-কুলের তুষ্টির জন্য প্রজাদের শোষণ করতেন। সে শোষণ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের সময়েও অব্যাহত ছিল। করগ্রহণে বা রাজ্যরক্ষায় প্রজাদের মতামত গ্রহণের প্রশ্ন ছিল না। সমাজ চলেছিল ঋষিবাক্য, শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা। বিবেকানন্দের মতে, এই সাধারণ মানুষই হল সমাজশক্তির উৎসস্থল। তিনি বলেন, 'সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধন-বলের দ্বারা, সে শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণ এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে। তাহা তত পরিমাণে দুর্বল,' তিনি আরও বলেন যে পৌরোহিত্য শক্তি এক সময় শক্তির আধার জনসাধারণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিল বলেই প্রজাশক্তির সাহায্যে রাজারা পুরোহতিদের পরাস্ত করতে পেরেছিল। রাজারাও নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে প্রজাশক্তি ও নিজেদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান তৈরী করেছিল। তার ফলে প্রজাশক্তির সাহায্যে বণিকেরা রাজাদের নিহত করে অথবা খেলার পুতুল বানিয়ে রাখে। এরপর বণিকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছে এবং জনসাধারণের সাহায্য অনাবশ্যক মনে করে জনসাধারণ থেকে নিজেদের দূরে রাখার চেষ্টা করেছে এবং এটাই হল বিণক শ্রেণীর মৃত্যুর কারণ। বিবেকানন্দের প্রশ্ন, 'আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়?' সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতই তিনি অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পৃথিবীতে কালক্রমে শূদ্রশাসন দেখা দেবে। 'তথাপি এমন সময়ে আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে; . . . তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্ত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে, এবং সকলে তাহার ফলাফল জানিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম, নাইহিলজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।'

শূদ্র শাসনকে জানিয়ে তিনি বলেন যে অপর কয়টি প্রথাই অর্থাৎ পুরোহিত, শক্রিয় ও বৈশ্যশাসন জগতে চলেছে, পরিবেশে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখদুঃখটা পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে, সেইটাই ভাল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে শূদ্রযুগ প্রথমে আসবে রাশিয়া অথবা চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান তার পরেই। কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল নবভারতের আবাহণমন্ত্র, 'নতুন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে।' জাতির মেরুদন্ড কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেণ, 'ঐ যারা চাষাভূষা, তাঁতি-জোলা, ভারতের নগণ্য মানুষ, তারাই আবহমান কাল ধরে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমের ফলও তারা পাচ্ছে না। . . . ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী — তোমাদের প্রণাম করি।'

৩৮.৩.১ সমাজতান্ত্রিক চিন্তা

১৮৯৬ সালের ১লা নভেম্বর মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন, 'I am a Socialist not because I think it is a perfect system but half a loaf is better than no bread.' অর্থাৎ 'আমি নিজেকে সমাজতন্ত্রী মনে করি। ঐ পদ্ধতি নিখুঁত বলে আমি সমাজতন্ত্রী নই, কিন্তু কিছু না থাকার চেয়ে ওর দ্বারা কিছু তো পাওয়া যাবে।' স্পষ্টতঃই তিনি সমাজতন্ত্রকে কোন আদর্শ সমাজব্যবস্থা বলে মনে করেন নি। কিন্তু তিনি এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে সমকালীন আংশিক সংস্কার সমূহের দ্বারা ভারতের লক্ষ লক্ষ অবহেলিত দরিদ্র মানুষের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 'সমস্ত ত্রুটির মূল এইখানে সত্যকার জাতি, যারা কুটীরে বাস করে, তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলে গেছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টার্ণ-প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হতে হতে তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হবার জন্যই তাদের জন্ম।' ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম জাতির মূল সমস্যাটির উপর আলোকপাত করেন। সে সমস্যা হল অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সমস্যা।

বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত বৈষম্যহীণ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হ'ল সকল মানুষের সমান অধিকার। এই সমান অধিকারের দাবীতে তিনি বলেন, 'একচেটিয় অধিকারের -একচেটিয়া দাবীর ছিল চলিয়া গিয়াছে।' 'বিশেষ অধিকারের ধারণা মনুষ্য জীবনের কলঙ্ক'। তাঁর মতে, অন্যকে বঞ্চিত করে নিজে সুবিধা ভোগ করার নামই অধিকারবাদ। তিনি বলেন, 'এই অধিকার-তারতম্যকে প্রচন্ড আঘাত করে উঠিয়ে দিতে হবেই। আমরা চাই কারো কোন বিশেষ অধিকার থাকবে না, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির সমান সুযোগ থাকবে।' বিবেকানন্দ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন যে মানুষে মানুষে সম্পূর্ণ সাম্য কোনদিনই সম্ভব নয়। মানুষের বাহ্যিক রূপ, শক্তি ও স্বাভাবিক সামর্থের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই থাকবে। তাই তিনি বলেন, 'বৈচিত্র্যকে নষ্ট না করে সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ। এই বৈচিত্র্যে একত্বের ধারণাই সাম্যবাদী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাঁর চিন্তায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের গুরুত্ব স্বীকৃত। তিনি বলেন, 'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি,' সমষ্টির গুরুত্ব স্বীকার করলেও তিনি সমষ্টির যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিসত্ত্বাকে বলি দিতে রাজী ছিলেন না। তাঁর মতে, ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্যই সমষ্টির কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্র সমন্বয় সূত্রে গ্রথিত। সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্বার্থের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তিসত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ। নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তির জন্যই তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লব বলতে তিনি রক্তক্ষয়ী শ্রেণীসংগ্রামকে বোঝেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে বিপ্লব হ'ল চেতনার বিপ্লব মানুষের মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন এবং তার মধ্যে দিয়ে জনগণের অধিকার লাভ। শূদ্র জাগরণ যে অপ্রতিরোধ্য সে কথা স্বামীজী জানতেন। কিন্তু ভারতের মাটিতে হিংসার পথে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। সেই কারণেই তিনি একটি গঠনমূলক পথ উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছিলেন। উদ্ধবর্ষের জাতিগুলিকে তিনি বারঁবার সতর্ক করে দিয়েছেন। নিম্নবর্ষের মানুষদের

সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে এবং তাদের সহযাত্রী হতে তিনি তাদের আহ্বান জানিয়েছেন। শ্রেণীসংগ্রাম নয়, পারস্পরিক প্রীতিসুলভ সহযোগিতা ও আদান প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণী-সমন্বয়ই ছিল তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তার চরম লক্ষ্য।

বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা মার্কসবাদের থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। মার্কসীয় চিন্তাধারার ভিত্তি হ'ল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। বিবেকানন্দ ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতাকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তিনি বস্তুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদের একটি অন্যতম দিক হ'ল শ্রেণীসংগ্রাম। বিবেকানন্দ শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী সহযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তৃতীয়ত, মার্কসবাদ অনুসারে ধর্ম হ'ল আমজনতার আফিস্। কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল সমাজগঠনের ঐক্যসূত্র। তিনি বলেন যে আমাদের কার্যের মূল কথাটি হ'ল ধর্মে এক বিন্দু আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতিবিধান। ধর্মের বহিরঙ্গ বা আনুষ্ঠানিক দিকটি'কে তিনি কখনই বড় করে দেখেন নি। তাঁর ধর্মচেতনার ভিত্তি হ'ল অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের মূল কথা হ'ল ব্রহ্মের সঙ্গে মানুষের একাত্মতা। সমাজজীবনে এই বৈদান্তিক দর্শনের রূপায়ণই ছিল বিবেকানন্দের চিন্তার সারমর্ম। তিনি একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে নুইয়ে পড়া জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হ'ল আত্মবিশ্বাসের। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম বিরাজ করেন, প্রত্যেক মানুষই হ'ল ব্রহ্মের অংশ একথা মানুষকে বোঝাতে হবে। মানুষের মধ্যে দেবতার এই উপলব্ধি মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে আত্মবিশ্বাস। এই উপলব্ধিই জাতপাত, সম্প্রদায়, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষে মানুষে গড়ে তোলে ঐক্যের বন্ধন। প্রতিটি মানুষকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং মানুষের হৃদয়বত্তার প্রসারের মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীকে ভ্রাতৃত্বের ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই জড়বাদ নয়, অধ্যাত্মবাদ ছিল বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের ভিত্তি। রক্তক্ষয়ী বিপ্লব নয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতাই ছিল তাঁর শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার পথ। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার পথে প্রধান অন্তরায় হ'ল দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ধর্মীয় অনাচার ও শ্রেণীশোষণ। এই অন্তরায়গুলি দূর করে যে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন তার মূল কথা হ'ল প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা। সমাজ ও জাতির অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন হ'ল ব্যক্তির সুস্থ, নীতিনিষ্ঠ ও সহৃদয় মন। সুস্থ ও নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য তিনি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, শিক্ষা বলতে তিনি পুঁজিগত বিদ্যা অর্জনের কথা বলেন নি। শিক্ষা বলতে বোঝায় মানুষের অন্তর্নিহিত সহজাত গুণাবলীর যথোচিত বিকাশ। চরিত্রগঠন তথা মানুষ গড়ে তোলাই হ'ল শিক্ষার লক্ষ্য।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে এ সত্যটিও প্রতিভাত হয়েছিল যে ভারতে জাতীয় জাগরণের জন্যে প্রয়োজন হল নারী-জাগরণ। তিনি বলেন, "স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। একপক্ষ পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।' স্ত্রীজাতির শিক্ষা এবং স্বাবলম্বনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে নারী জাগরণের অন্যতম সমর্থক হলেও তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আদর্শ ভারতীয় নারী চরিত্র গঠনের কথা বলেন।

৩৮.৪ ধর্ম ও ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ চিন্তাধারার অন্যতম দিক ছিল তাঁর ধর্ম সহিষ্ণুতার ধারণা। ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে তাঁর ভাষণ থেকে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন যে কেউ যদি মনে করে যে কেবলমাত্র তাঁর ধর্মের অস্তিত্ব বজায় থাকবে এবং অপর সকল ধর্মের বিনাশ ঘটবে তাহলে তিনি করুণার পাত্র। শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকাতলে লেখা হবে 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি। ধর্মকে তিনি মানুষের মুক্তির উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন। নিছক আচারসর্বস্ব, মনুষ্যত্ব বিমুখ কোনো ধর্মাচরণকেই তিনি প্রশ্রয় দেননি। জীবের কল্যাণ সাধন হয়না যে ধর্মে, সেই ধর্মকে তিনি নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করতে বলেন। ক্ষুধিতের অন্নদাতা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় নইলে ঈশ্বরের অস্তিত্বেরও অর্থ নেই। 'জীবকে শিবজ্ঞানে' সেবা করার মহামন্ত্র তিনি দিয়েছেন। কেন না, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে ঈশী সত্তা, এই অন্তর্নিহিত (divinity already in man) ঈশ্বরের জাগরণেই তার আধ্যাত্মিক মুক্তি। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার এই হল শাশ্বত বাণী। এই সমুন্নত ধর্মভাবনার সামনে কোনও ধর্মেরই কোনও হানি হওয়ার, ক্ষুন্ন হওয়ার প্রশ্ন ওঠেনা। এমনকি এই ধর্ম-ভাবনায় মানুষের ঐহ্যিক প্রয়োজনও যথাযথ গুরুত্ব পেতে পারে। সবচেয়ে বড়োকথা, মানুষকে স্বাবলম্বী হ'তে, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে, আত্মশক্তির জাগরণ ঘটাতে স্বামীজী সকলকেই আহ্বান জানিয়েছেন নির্ভীক হওয়ার, বলিষ্ঠ হওয়ার, অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়ানোর। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' উপনিষদের এই বানী সদা জাগরূক থাকা দরকার সকলের মনে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ যেহেতু ধর্মভাবাপন্ন মানুষের দেশ, বহু ধর্মের দেশ, প্রাচীন সংস্কারের দেশ, সেহেতু এমনই একটি ধর্মভাবনার অতিশয় প্রয়োজন, যা আধুনিক জগতের সমস্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার শক্তি দিতে পারে। শিকাগো মহাধর্মসম্মেলনে (১৮৯৩) তাই বিশ্বব্যাপী সাড়া জেগেছিল স্বামীজীর ধর্মপ্রবচন শুনে। এ ধর্ম মানুষের ধর্ম। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়।

সাধারণভাবে রাজনীতিজ্ঞ বলতে যা বোঝায় স্বামী বিবেকানন্দ তা ছিলেন না। তাথাপি ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তাঁর স্থান এবং অবদান অবিস্মরণীয়। পরাধীন অবদমিত জাতির বুকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন ভারতচেতনা। তিনি জগৎসভায় ভারতকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে ভারতবাসীকে আত্মসচেতন করে তোলেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন, "হীনম্মন্যতা যখন ভারতবাসীকে পেয়ে বসেছিল এবং নেতারা ভাবছিলেন পাশ্চাত্যের অনুকরণের ভিতর দিয়েই ভারতে মুক্তি আসবে, জাতির সেই দুঃসময়ের দিনে স্বামীজী সবাইকে শুনালেন ভারত আদৌ নিঃস্ব নয়, তারও জগতকে অনেক দেবার আছে এবং সে অনেক দিয়েছেও।..... তাঁর ভিতর দিয়ে ভারত নিজেকে চিনেছে ও জেনেছে, নিজের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে।" তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর চিন্তাধারা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিকচিহ্ন হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর চিন্তার ভাবভূমিতেই জন্ম নিয়েছিল চরমপন্থী বিপ্লবী কর্মতৎপরতা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পটভূমিতে তিনি এমন একটি দৃঢ়তা আনতে পেরেছিলেন যা ছিল নিতান্তই ভারতীয়। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন বিশ্বজনীন মহামানব যাঁর আন্তর্জাতিকতার

ধারণা সকল জাতির মহামিলনের পথের নিশানা বহন করে। তিনি ছিলেন শান্তিপূর্ণ পথে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক। জাতপাত, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলে তিনি জাতীয় সংহতির ধারণাকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সর্বোপরি ধর্মান্ধতা নয়, পরধর্ম সহিষ্ণুতা ছিল তাঁর চিন্তার বিশিষ্ট দিক। স্বামী বিবেকানন্দের বিস্তার আবেদন ভারতবাসীর কাছে চিরকালীন আবেদন। অতীতের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতপথিক বিবেকানন্দ ভবিষ্যতেও ভারতবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত করবেন। নতুন ভারত গড়ে তোলার পথে স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণী ভারতবাসীর চিরকালের পাথেয়।

৩৮.৫ সারাংশ

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা তাঁর সমসাময়িক ভারতে রাজনীতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ছিল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। প্রচলিত উদারপন্থী ভাবধারার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের চিন্তা ছিল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তিনি আবেদন-নিবেদনের রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর বাণী ছিল আত্মশক্তি উন্মেষের অগ্নিবাণী। আত্মগ্লনি ও হতাশায় নিমজ্জমান পরাধীন ভারতবাসীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এক নতুন যুগের ও নতুন পথের দিশারী।

বিবেকানন্দের চিন্তাধারার বিশিষ্ট দিক ছিল তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণা। তিনি জাতীয়তাবাদকে এক আধ্যাত্মিক পটভূমির উপর স্থাপন করেছিলেন। পরাধীনতার শৃংখল মোচনের জন্যে তিনি দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করে দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশ প্রেমের আবেগ সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবোধের মধ্যে ছিল অন্ধ অনুকরণ বর্জন এবং নিজ জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের চেষ্টা। তিনি মনে করতেন যে প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য হল আধ্যাত্মিক শক্তি। অদ্বৈত দর্শন ও বেদান্তে বিশ্বাসী বিবেকানন্দ সর্বমানবের মধ্যে দেখেছেন ব্রহ্মের প্রকাশ। এই উপলব্ধি থেকেই এসেছে তাঁর সর্বজনীন মানবতাবোধ। এই সর্বজনীন মানবতাবোধের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করলেও তাঁর জাতীয়তাবোধ অন্ধ স্বজাতি বাৎসল্য ছিল না। তিনি কখনই বিজাতি-বিদ্বেষ পোষণ করেন নি । তিনি ছিলেন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আদর্শের পূজারী। তাঁর এই প্রকৃত জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছিল আন্তর্জাতিকতার আদর্শের অনুসারী।

বিবেকানন্দ ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এক শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষকেই তিনি রাষ্ট্রশক্তির আধার বলে মনে করতেন। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সাধারণ মানুষের শোষণ ও অবহেলার চিত্রটি তুলে ধরেছেন। সত্যদ্রষ্টা বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পৃথিবীতে কালক্রমে শূদ্রশাসন দেখা দেবে। তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলেছেন। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত এক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি সকল মানুষের সমান অধিকারের সমর্থক ছিলেন। বিশেষ অধিকারের ধারণাকে তিনি মানবজীবনের কলঙ্ক বলে মনে করতেন।

বিবেকানন্দের চিন্তায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের গুরুত্ব স্বীকৃত। সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্বার্থের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তি সত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ। নিপীড়িত মানবত্মার মুক্তির জন্যেই তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক বিপ্লব। বলতে তিনি রক্তক্ষয়ী শ্রেণী সংগ্রামের বোঝেন নি।

বিবেকানন্দের মূল কথা ছিল প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা। শিক্ষা বলতে তিনি পুঁজিগত বিদ্যা অর্জনের কথা বলেন নি। শিক্ষা বলতে বোঝায় মানুষের অন্তর্নিহিত সহজাত গুণাবলীর যথোচিত বিকাশ।

বিবেকানন্দের চিন্তাধারার বিশিষ্ট দিক ছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার, ধর্ম সহিষ্ণুতার, ধর্মমিলনের ধারণা। এ চিন্তার আবেদন তাই চিরকালীন।

৩৮.৬ অনুশীলণী

১। স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণা বিশ্লেষণ করুন।

২। সামাজিক ন্যায় সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৩। কী অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন ?

৪। 'শূদ্রের জাগরণ' বলতে স্বামীজী কী বুঝিয়েছেন ?

৫। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার বিশিষ্ট দিকগুলি আলোচনা করুন।

৩৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ : স্বামীজীর স্বাধীনভারতের স্বপ্ন, উদ্বোধন, ১৯৯২

২। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সুবর্ণরেখা, ১৯৬৮ (১ম সংস্করণ)

৩। Dr. Subodh Chandra Sengupta : Swami Vivekananda and Indian Nationalism, Samsad 1984.

৪। Dr. R.K. Dasgupta : Swami Vivekananda's Vedantirc : Socialism RMIC, Golpark,

৫। Swami Lokeswarananda : Swami Vivekananda, His Life and Message, RMIC, 1994.

একক ৩৯ □ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গঠন

৩৯.০ উদ্দেশ্য

৩৯.১ প্রস্তাবনা

৩৯.২ সংক্ষিপ্ত জীবণী

৩৯.৩ বঙ্কিম চিন্তায় বিবিধ প্রভাব

৩৯.৪ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি ও সমাজ ভাবনা

৩৯.৫ বঙ্কিমচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ

৩৯.৬ বঙ্কিমচন্দ্র ও সাম্য

৩৯.৭ সারাংশ

৩৯.৮ অনুশীলণী

৩৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে যা আলোচিত হবে তার থেকে আমরা বুঝতে পারব :

- সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যাণধারণা এবং তাঁর ওপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যচিন্তার প্রভাব;
- জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমের পর্যালোচনা;
- সামাজিক সাম্য ও অসাম্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ;

৩৯.১ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসায় তাঁদের মনে সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা, মনন, শিল্প ও সাহিত্যের জগতেও নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে। এই নবজাগরণের পরিবেশে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে এক নতুন প্রাণের বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হন। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম থেকে শুরু করে সমাজতত্ত্ব, সাম্য, মানবতা, স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে তিনি যে গভীর বিশ্লেষণ-ধর্মী মতামত প্রকাশ করেন তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। জাতীয়তাবোধ উন্মেষেও বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বাদেশিকতাবোধ

জাগ্রত করার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ, দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি, সমানাধিকার, নারীজাতির মর্যাদা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তিনি অক্লান্তভাবে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হলেন সেই বিরল প্রতিভা যাঁর মধ্যে আমরা পাশ্চাত্য আধুনিকতা ও যুক্তিবাদ এবং ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের এক অসামান্য মেলবন্ধন ঘটতে দেখি। তাঁর সাহিত্যরচনা ও কর্মজীবনের প্রায় দেড়শতক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সমাজ ও রাজনীতি আলোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

৩৯.২ সংক্ষিপ্ত জীবণী

বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার ব্যপ্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি লাভ করেছিল তাঁর কালজয়ী উপন্যাস সমূহে এবং জীবনলব্ধ তথ্য ও প্রত্যয় সমৃদ্ধ তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধে। এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার জন্ম ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে ২৪ পরগণা জেলার কাঁটালপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা শ্রী যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের ডেপুটি কালেক্টর। তিনি ফারসী ও ইংরেজীতে সুপন্ডিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রেরা চার ভাই — শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। পিতা যাদবচন্দ্র তাঁকে মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। এরপর হুগলী কলেজেও বঙ্কিম ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় বঙ্কিমের প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস। বহুবিস্তৃত ইতিহাস চর্চার পরিচয় পরবর্তীকালে তাঁর রচিত উপন্যাস ও প্রবন্ধে আমরা ব্যাপকভাবে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের বিখ্যাত শিক্ষকদের কাছে বাংলাভাষায় পাঠ নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃতচর্চাও করেছিলেন। তিনি চতুষ্পাঠীতে গিয়ে সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদের নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ এবং বিভিন্ন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করতেন। কর্মজীবনেও বঙ্কিম এই চর্চা বজায় রেখেছিলেন। তিনি দুবছর প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বি. এ পাশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে ভক্তি, বিশ্বাস ও অধ্যাত্ববোধের পরিমন্ডলে। কাঁটালপাড়ায় তাঁর পিতৃগৃহে রাধাগোবন্দ জিউর নিত্যপূজা ও সেবা বঙ্কিমের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমের কর্মজীবন শুরু হয় যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে। এই সময় থেকে ১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত তিনি মেদিনীপুর, খুলনা, বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার, বহরমপুর, বারাসাত, হাওড়া, হুগলী, আলিপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে কর্মসূত্রে বদলি হয়েছেন। এই সময়কার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন স্তরের মানুষকে কাছ থেকে দেখা, সবই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

১৮৮৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ১৮৯২ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য 'বেংগলী সিলেকস্ন' প্রকাশ করেন। এই বছরেই তাঁকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব দেওয়া হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সৌখিন পুরুষ ছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য রক্ষা করে চলতেন।

তিনি যদুভট্ট তানরাজ নামে এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের কাছে সঙ্গীত চর্চা করেছিলেন। জ্যোতিষ গণনাও তাঁকে যথেষ্ঠ আকর্ষণ করত। বিজ্ঞানচর্চাতেও তাঁর অপার উৎসাহ ছিল।

এগারো বছর বয়সে বঙ্কিম প্রথম বিবাহ করেন। দশ বছর পর তাঁর প্রথম পত্নীর মৃত্যু ঘটে। ১৮৬০ সালে তিনি আবার বিবাহ করেন — হালিশহরের চৌধুরী বাড়ীর দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা রামলক্ষ্মী দেবীকে।

১৮৫২ সালে 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস Rajmohon's Wife ইংরেজী ভাষায় রচিত। এর পরে বঙ্কিম ইংরেজীতে আর কোন উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর রচিত 'দুর্গশানন্দিনী'কেই প্রথম বাংলা উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া হয়। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয় —

প্রথম পর্ব — দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা ও মৃণালিণী,

দ্বিতীয় পর্ব — বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, রজণী, কৃষ্ণকান্তের উইল ও রাজসিংহ।

তৃতীয় পর্ব — আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম।

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠকীর্তি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আবির্ভাব, বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তাঁর অমূল্য প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। আমাদের এই আলোচনায় তাঁর প্রবন্ধগুলিই হবে মূল ভিত্তি। ১৮৯৪ সালে এই মহান প্রতিভা চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

৩৯.৩ বঙ্কিমচিন্তায় বিবিধ প্রভাব

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কোন নির্দিষ্ট যুগ বা কোন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বকে সঠিকভাবে জানতে গেলে কোন্ পরিবেশে বা কোন্ কোন্ সামাজিক শক্তির ক্রিয়ায় এবং ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গে তার আর্বিভাব তা অনুধাবন করা অপরিহার্য। বঙ্কিমচন্দ্র, ও তাঁর চিন্তাধারার সঠিক বিশ্লেষণ ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য তাঁর পূর্বগামী কালের পরিচয় আবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের মাটিতে বৃটিশ শাসন দৃঢ় ভিত্তি পেতে শুরু করেছে এবং বঙ্কিম-পূর্ব কালকে আমরা একটি সমাজ-সংকটের কাল হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই সময় সনাতন ভাবধারা ও নতুন চিন্তাধারার মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয় এবং ভারতে ধীরে ধীরে এক নতুন ব্যক্তিসত্তা ও সংস্কৃতির আর্বিভাব ঘটতে থাকে। ঊনিশ শতকের প্রথমভাগে ভারতে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয় এবং এই আন্দোলনের ফলে ভারতে আধুনিক চিন্তাধারা ও সংগঠনের বিকাশ ঘটে।

এদেশের চিন্তানায়কগণ উদারনৈতিক, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানাশ্রয়ী চিন্তাভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হন। সচেতনতা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে গড়ে ওঠে বাংলার বিদগ্ধ সমাজে। সেকারণে অনেকেই এই সময়টিকে বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রারম্ভ বলে বর্ণনা করেন।

ছাত্র-অবস্থা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র এক নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টি নিয়ে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা লেখার সুবাদে তিনি মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরগুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি লেখকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন।

রামমোহনের আধুনিক চিন্তাধারা, ধর্ম ও ইহজীবন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ণ, দেবেন্দ্রনাথের খ্রীষ্টধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তকটির প্রকাশ এ সমস্ত ঘটনাই নানাভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। ডিরোজিও শিষ্যদের 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন, 'সাধারণ জ্ঞানোপর্জিকা সভা', 'দেশ হিতৈষিণী সভা, তত্ত্ববোধিনী সভার, কার্যকলাপ, রাজেন্দ্রলালমিত্রের বিভিন্ন রচনা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব বঙ্কিমের মনে বিশেষ রেখাপাত করেছিল। কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে বঙ্কিম অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের গুণভূষিত' বলে উল্লেখ করেছিলেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে' নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে আলোড়ণ ফেলেছিলেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন বঙ্কিমের বিশিষ্ট বন্ধু। এই বন্ধুত্ব বঙ্কিমের সাহিত্য চর্চাকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছিল।

সমকালীন স্বাদেশিকতার চেতনাও বঙ্কিম মানসকে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত করেছিল। দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং শরীরচর্চার জন্য নবগোপাল মিত্র 'হিন্দুমেলার' আয়োজন করেছিলেন। এই আয়োজন সারা দেশে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করে। বঙ্কিম সাহিত্যের মাধ্যমে এই নবচেতনার প্রসার জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

সরকারী চাকরীতে যোগদানের পর বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এবং সেই গবেষণালব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল আমরা দেখতে পাই তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও উপন্যাসে।

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য দর্শন এবং চিন্তারীতি দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মতই তাঁর প্রিয় পঠনীয় বিষয় ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস। বহু প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয় আলোচনার রীতি আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে নতুন। এই রীতিটি বাংলা সাহিত্যে প্রচলন করেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইতিহাস ছাড়া ইউরোপে উদ্ভূত আরও দুটি বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। একটি অর্থনীতি, আর একটি রাজনীতি। 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাম্য' এবং 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে তিনটি বিষয়েরই সন্ধান মেলে। বাক্‌ল-এর History of Civilization in England এবং লেকি রচিত History of Rationalism in Europe' গ্রন্থ দুটি 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনাকালে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষ মানবতাবাদী জীবন-দর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-চিন্তাকে জাগ্রত করেছিল। লক্-এর অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তাধারা, মঁতেস্কু, টেন প্রভৃতির জীবনদর্শন, হব্‌সের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ডারউইনের খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী ক্রমবিবর্তনবাদী বৈপ্লবিক চিন্তা এবং ভলতেয়ার, হিউম, রীড, রুশো, পেইন প্রভৃতি চিন্তানায়করা

বঙ্কিমকে প্রখর যুক্তিবাদের দিকে আকর্ষণ করেছিলেন। সাঁ সিঁমো, ফুৎরিয়ের, লুই ব্লাঁ প্রভৃতির সাম্যবাদী চিন্তা বঙ্কিমকে উদ্বুদ্ধ করেছিল 'সাম্য' গ্রন্থ রচনায়। তবে সাম্যচিন্তায় বঙ্কিমকে সবচাইতে বেশী প্রভাবিত করেছিলেন 'সাম্যাবতার রুশো'।

প্রবন্ধ রচনার প্রথম যুগে কোন পূর্ণ জীবনদর্শন আমরা বঙ্কিমের লেখায় পাইনা। জীবনের খন্ডিত ও বিচ্ছিন্ন দিকগুলিই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। এই বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলি পরবর্তীকালে একটি বৃহত্তর জীবন দর্শনের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হয় দুটি গ্রন্থ, গ্রন্থকার রবার্ট সিলী, 'Ecce Homo' এবং 'Natural Religion'. সিলী খৃষ্টধর্মের একটি নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন এবং culture বা সংস্কৃতিকে প্রায় ধর্মের বিকল্প হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যীশুখৃষ্ট্রের যুগোপযোগী এক মানবমূর্ত্তি গড়তে। বঙ্কিমচন্দ্রও অলৌকিকতাবর্জিত অনুশীলন তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যার ভিত্তি ছিল যুক্তি। অনুশীলন ধর্মকে তিনি বলেছেন Doctrine of Culture. মহাভারতের কৃষ্ণের মধ্যে এই ধর্মের পূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন বঙ্কিম। তিনি বলেছিলেন। "কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক তথা মানবতাবাদী চিন্তায় যে জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার এবং কোঁৎ-এর হিতবাদী এবং প্রত্যক্ষ মানবতাবাদী জীবনদর্শন ছায়া ফেলেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইউটিলিটারিয়ানদের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিমের সমাজ-চিন্তায়। তবে যুক্তিবাদিতার পরিপ্রেক্ষিতে কোঁৎ-এর মতই তাঁকে সব থেকে বেশী সাহায্য করেছিল।

বঙ্কিম ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বৈশিষ্ট্যকেই তাঁর রচনায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন যা জীবন্ত, যা যুগোপযোগী, আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে যার বাধা নেই।

৩৯.৪ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি ও সমাজ ভাবনা

বঙ্কিমচন্দ্রর সমাজ ও রাজনীতি চিন্তার বিশিষ্টতা হ'ল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজদর্শন প্রতিষ্ঠা করা যার মূলে আছে একটি সমৃদ্ধ জাতি ও দেশগঠনের ভাবনা। জাতিগঠনের প্রশ্নকে সামনে রেখেই তিনি সমকালীন সমাজ, শৃঙ্খলা, ধর্ম, রাজনৈতিক তত্ত্ব, প্রতিষ্ঠান, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। শানিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি এবং সহৃদয় সহমর্মিতার সাহায্যে তিনি সমগ্র জাতির হৃদস্পন্দন অনুভব করতে পেরেছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে' বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত "ভারত কলঙ্ক', 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'জাতিবৈর', 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'কমলাকান্তের' বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনায় বঙ্কিমের সমাজ ভাবনা ও রাজনীতি বিষয়ক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সমকালীন রাজনৈতিক সংগঠন - যেমন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, সভাসমিতি -- যেমন হিন্দু মেলা, জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক আইন, সংবাদপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বঙ্কিম, সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে কখনই যুক্ত করেননি তিনি, কিন্তু তাঁর বিভিন্ন রচনায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে রাজনীতির বিচিত্র প্রেক্ষাপট - শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, প্রশাসন ও মানবসম্পর্ক, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রভৃতি।

ইতিহাস চেতনাই হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি ও সমাজ বিশ্লেষণের অন্যতম কেন্দ্রীয় উপাদান। বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস পুনর্গঠনে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণার উৎসে ছিল গভীর স্বদেশ প্রেম এবং গৌরবময় অতীত পুনরুদ্ধার করে জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির পুনর্গঠন। প্রবন্ধ তো বটেই বঙ্কিম তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেও ইতিহাসকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রাজনৈতিক জাগরণের অন্যতম শর্ত ইতিহাসবোধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চায় তুর্কি শাসন, পাঠান ও মোগল শাসনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সমসাময়িক কাল পর্য্যন্ত ইংরেজ শাসনের বিবিধ বিষয়ের মূল্যায়ণ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায় তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল মূলত বাংলা দেশের ইতিহাস। তবে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষের রূপ যে বাংলাদেশেই আছে সে বিষয়ে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলার পরাধীনতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বঙ্কিম কতগুলি তথ্য তুলে ধরেছেন যেগুলি আজও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা পরবর্তী অংশে জাতীয়তাবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলি উপস্থাপিত করব।

দেশের স্বাধীনতা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। এই চিন্তা প্রথাগত ধারণাবদ্ধ নয়, মৌলিক ও যুক্তিনির্ভর। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী স্বদেশবাসী শাসিত দেশই হ'ল স্বাধীন, বিদেশী কর্তৃক শাসিত দেশ মানেই পরাধীন দেশ। কিন্তু বঙ্কিম আদৌ এই প্রচলিত ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজী 'Liberty' ও 'Independence' শব্দদুটির ভিন্ন তাৎপর্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দুটি শব্দেরই আক্ষরিক অর্থ 'স্বাধীনতা' হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে 'Liberty' শব্দটির ভূমিকা বা তাৎপর্য অনেক বেশী।

একটি দেশ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন কিনা তা নির্ভর করে শাসিত প্রজাসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত জীবনযাত্রার ওপর। বঙ্কিমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে একটি দেশকে প্রকৃত স্বাধীন বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত যদি সেই দেশের রাজা বা শাসক বহির্দেশীয় হয়েও জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারেন। অর্থাৎ বাহ্যত 'পরাধীন' একটি দেশকে স্বাধীন বলে অভিহিত করতে তিনি কুণ্ঠিত নন। আবার একই যুক্তিতে স্বদেশবাসী শাসিত একটি স্বাধীন দেশকে তিনি স্বাধীন আখ্যা দিতে রাজী নন যদি সেই দেশের সাধারণ মানুষ শোষিত ও নির্যতিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন, আধুনিক (তাঁর সমসাময়িক) ভারতে একজন সাধারণ ভারতীয় ও ইংরেজের মধ্যে যে বৈষম্য তার চেয়ে অনেক বেশী পীড়াদায়ক বৈষম্য ও ব্যবধান ছিল

প্রাচীন ভারতে সাধারণ শূদ্রপ্রজাদের সঙ্গে রাজপুরুষ ব্রাহ্মণের। কাজেই ব্রাহ্মণশাসিত সেই প্রাচীন ভারতবর্ষকে তিনি কখনও স্বাধীন ভারতবর্ষ বলে মেনে নেননি। তিনি বলেছেন, "যে পীড়িত হয়। তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্নজাতির পীড়ন, উভয়ই সমান।"

রাজনীতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি' প্রবন্ধটি মূল্যবান। মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরকে নারদ যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলিকে তালিকাবদ্ধ করেছেন তিনি। এই উপদেশে রাজাকে কৃষি, বাণিজ্য, আয়-ব্যয় শ্রবণ, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্মান, পৌরকার্য দর্শন ও জনপদ সংরক্ষণের আটটি গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য সঠিকভাবে সমাধা করার কথা বলা হয়েছে। মন্ত্রিসভায় মন্ত্রণাকাজের গোপনীয়তা রক্ষা, পররাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, মন্ত্রীপদে যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকের নিয়োগ, কাজের দ্রুত সম্পাদন, খাদ্য সঞ্চয়, ন্যায়বিচার, সমদৃষ্টি নিয়ে রাজ্যশাসন, সৈন্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় প্রশ্নে নারদ রাজাকে যা পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা আজকের যুগেও সমান প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক সমৃদ্ধি, প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ, জনসংযোগ রক্ষা এবং রাজকার্য সুসম্পন্ন করার যে উপদেশগুলি নারদবাক্যে বিদ্যমান সেগুলি আধুনিক রাষ্ট্রশাসককে মেনে চলার পরামর্শ দেন বঙ্কিম, "রাজনীতি বিশারদ ইংরেজেরাও তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিলে, তাহাদিগের উপকার হয়।"

কমলাকান্ত পর্যায়ের 'পলিটিক্স', একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। কমলাকান্তর মুখ দিয়ে বঙ্কিম বলছেন, আমাদের দেশের ক্ষেত্রে রাজনীতির ইচ্ছা, "বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমণের আকাঙ্খার মত। অন্ধের চিত্রদর্শন লালসার মত . . . . . , ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্‌স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুববাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহীমাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিকস নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাওগো!" ইহাই আমাদের পলিটিক্‌স্‌।" বঙ্কিম এক্ষেত্রে কটাক্ষ করেছেন এদেশের মৌলিকতা বর্জিত, পরনির্ভর রাজনীতির প্রতি। তাঁরমতে, সমকালীন রাজনীতির দুটি প্রবণতা — একটি কুক্কুর জাতীয় ও অন্যটি বৃষজাতীয়। কুকুরের প্রবণতা হ'ল দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করা, শান্তিপূর্ণ ও ধৈর্যশীলতার সঙ্গে কাম্যবস্তুর জন্য অপেক্ষা করা আর আঘাত এলে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন। সম্ভবতঃ তৎকালীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে নরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভব হয়েছিল তাকেই বঙ্কিমচন্দ্র কটাক্ষ করেছেন। আর অন্যটি হল এই যে, বৃষ সব গরুকে হটিয়ে দিয়ে গায়ের জোরে জাবনা দখল করে নেয়। অর্থাৎ কোনো কৌশল নয়, শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের পথ অবলম্বন করে দস্যুর মত নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে।

রামমোহনের মতই বঙ্কিমচন্দ্র প্রশাসন ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে দেশের আইনব্যবস্থা ধনীর অত্যাচার থেকে দরিদ্রকে রক্ষা করতে অক্ষম, যারা মামলাসংক্রান্ত সর্বব্যাপারে - যেমন উকিল নিয়োগ, সাক্ষী যোগাড়, আমলা ও চাপরাশিদের জন্য — উৎকোচের ব্যবস্থা করতে সক্ষম তদের জন্যই বিচারালয়ের দ্বার উন্মুক্ত। অনেক সময় সর্বস্ব ব্যয় করেও সুবিচার পাওয়া যায়না। প্রায় সর্বত্রই মামলার নিষ্পত্তি হতে প্রচুর সময় লাগে। তবে ইংরেজ প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা করলেও বঙ্কিম তাকে হিন্দুশাসনকালের বিচারব্যবস্থার তুলনায় উন্নততর বলে বর্ণনা করছেন। কারণ

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের প্রতি প্রযোজ্য আইন ছিল স্বতন্ত্র। কিন্তু ইংরেজ আমলে সকল প্রজাই একই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, কোনো শ্রেণীর জোরে কেউ আধিপত্যে অধিকারী নয়। তবে একথাও ঠিক কোন ইংরেজের বিচার করার অধিকার ভারতীয়দের ছিল না, প্রাচীন ভারতে কোন শূদ্রও ব্রাহ্মণের বিচার করতে পারতনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের গুরুত্বই ছিল বেশী। মানবজীবনের ধারক ও বাহক সমাজ। রাষ্ট্রের স্থান সেখানে গৌণ। সমাজের অগ্রগতির জন্য তিনি চেয়েছিলেন জাতির মানসজীবনে আমূল রূপান্তর যা সম্ভব শুধুমাত্র যুক্তিবাদী চিন্তার বিস্তারে। সমাজ ব্যবস্থার দোষত্রুটি স্বীকার করেও তিনি মানুষকে সমাজের কাছে অনুগত থাকতে উপদেশ দেন —

"সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দন্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ ও রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।"

বঙ্কিমের প্রশ্ন, 'সামাজিক দুঃখ শুরু হল কবে থেকে ?' 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধে তিনি সামাজিক দুঃখের স্বরূপ ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে সমাজ সংস্থাপনের পর থেকেই সামাজিক দুঃখের শুরু এবং এই দুঃখের মূলে রয়েছে দারিদ্র্য। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই সামাজিক দুঃখ নিবারণেরই ইতিহাস। বঙ্কিম রুশোকে অনুসরণ করে বলেছেন, মানুষ সমাজবদ্ধ হবার পূর্বে দারিদ্র্য ছিলনা। স্বাধীনতার হানিকেও বঙ্কিম সামাজিক দুঃখের অপর কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

রাজনীতি ও সমাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ। বঙ্কিমের মতে সমাজশক্তির অত্যাচারই এই সামাজিক দুঃখের মূল কারণ। এই অত্যাচারী কখনও রাজা, কখনও সমাজশাসক — ইউরোপে ধর্মযাজকগণ, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকুল, আবার কখনও অন্য সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী। বঙ্কিমের ধারণা 'বাহুবল' অথবা 'বাক্যবল'ই এই অন্যায় নিপীড়ণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত অস্ত্র। শাসক-শক্তি অত্যাচারী হ'লে জনসাধারণ সংহত হয়ে বাহুবলের সাহায্যে সে অত্যাচার নিবারণ করতে পারে। কিন্তু বাহুবল হ'ল পশুবল। তাই তাঁর মতে পশুবলের সাহায্যে সাময়িকভাবে সবলের অত্যাচার নিবারণ করা গেলেও সমাজের স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়, বরং বাহুবলের দ্বারা উন্নতি অপেক্ষা অবনতির সম্ভাবনাই বেশী। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বাক্যবলের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী বাক্যবল বলতে বঙ্কিম শিক্ষার কথাই বলেছেন — "শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই সমাজের হৃদয়ঙ্গাতা হয়।" তবে আত্মরক্ষার জন্য বাহুবল প্রয়োজনীয়। ভারতবের্ষর দুর্গতির কারণ যে বাহুবলের অভাবে ঘটেছে এই অভিমত বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন।

সামাজিক অগ্রগতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন জাতির মানস জীবনে আমূল রূপান্তর। তাঁর মতে সামাজিক অগ্রগতির নিয়ামক শাস্ত্র নয়, সমাজ অগ্রগতির নিয়ামক হল বিচারবুদ্ধি ও সামাজিক মূল্যবোধ। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে তিনি গ্রহণ করেননি। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তক অথবা বহু বিবাহ নিবর্তক সমাজিক আন্দোলনের করুণ পরিণতি দেখে বঙ্কিম এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হয়েছিলেন যে, শাস্ত্রের নজীর দেখিয়ে বা আইনের সাহায্যে জাতীয় জীবনের বহুকাল সঞ্চিত কুসংস্কার নির্মূল করা অসম্ভব ব্যাপার। একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যেই মানুষের মনে মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবোধের জাগরণ হতে পারে। মানুষের মনে সামাজিক মূল্যবোধগুলি প্রোথিত হলে সমাজসংস্কার হবে অতিসহজেই এবং একই সঙ্গে সমাজের ধারাও বাজায় থাকবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এক আদর্শ দেশপ্রেমিক। তাঁর একনিষ্ঠ দেশপ্রেম থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল জাতি গঠনের ভাবনা। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্যের অভাব তাঁকে পীড়িত করেছিল। বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং উপন্যাসে বারবার তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর সাম্য চিন্তা এবং জাতীয়তাবাদী ভাবনা। এই দুটি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এবং বিশ্লেষণ পৃথক আলোচনার দাবী রাখে। আমরাও অচিরেই সেই আলোচনায় প্রবেশ করব।

৩৯.৫ বঙ্কিমচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ

ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার অন্যতম ফলশ্রুতি হল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। তবে রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির চেষ্টায় চর্চার সূত্রপাত প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রের চর্চার সূত্রপাত হলেও ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা হয়েছিল মূলত ইউরোপীয় মনীষীদের দ্বারা। ১৮৫০ -এর পরে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভারততত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতি সাহিত্যের অনুবাদ এবং কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ শিক্ষিত দেশবাসীকে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ করে তোলে।

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন ও চর্চা করেছিলেন। বস্তুত তাঁর জাতীয়তাবাদ ও জাতিগঠনের ধারণা সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ণ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের তাঁর ইতিহাস চেতনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। অনুসন্ধানী পাঠক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র অসংখ্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ বিশ্লেষণ করে প্রাচীন ভারতের অজ্ঞাত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাষ্ট্র, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা ও সভ্যতার সঠিক পরিচয়ের জন্য সর্বাগ্রে ইতিহাসের জ্ঞান আবশ্যক - যে জ্ঞান শুধু রাজারাজড়ার সিংহাসন প্রাপ্তির কাহিনী নয় বা কেবলমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধিচুক্তির তথ্যও নয়, ইতিহাস আসলে মাটি ও মানুষের আলোচনা। একনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চায় তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিল, ভারতীয় রচয়িতা দ্বারা প্রণীত ভারত ইতিহাস-এর অভাব তাঁকে পীড়িত করেছিল। পাশ্চাত্য পন্ডিতদের ও মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচিত ভারতের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্রের মতে অজ্ঞতা, পরজাতি বিদ্বেষ ও বিজিতের প্রতি বিজেতার দম্ভপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে ব্যগ্র হয়েছিলেন বাংলার প্রকৃত ইতিহাস রচনায়। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলা ও ভারতবর্ষ তাঁর চিন্তায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বাংলাদেশের গৌরবকে তিনি বৃহত্তর আর্য-গৌরবের অংশ হিসাবেই দেখেছেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সহযোগিতায় সুপরিকল্পিত ভাবে বাংলাদেশ ও বাঙালীজাতির যথার্থ ইতিহাস রচনার সংকল্প গ্রহণ করলেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য,

বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে একটি পত্রে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য, তা লিখে উঠতে পারেননি। তবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ভারত কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' এবং 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি' নামক প্রবন্ধগুলিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমের ইতিহাস চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমাজ জীবন সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা,' 'বঙ্গে ব্রাহ্মনাধিকার', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা করেছেন অন্যদিকে বস্তুগত আলোচনার নিরিখে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা জাতীয়তাবোধের ভাবনা দ্বারা পুষ্ট। কঠোর পরিশ্রমে একটি একটি করে তথ্য সমাবেশ করে তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রকৃতি বিচার করেছেন, তিনি বিশেষ করে ভারতের পূর্বস্থাপিত অধিবাসীদের সঙ্গে বহিরাগত জাতির সংঘাতের ঘটনাগুলিকে আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজশাসনের পূর্বে ভারতীয় ঐক্য বা ভারতবোধ বলে কিছু ছিলনা। ভারতবর্ষ বারবার বাইরের জাতি দ্বারা বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত হয়েছে। কখনও বিজেতা জাতি এইদেশ লুণ্ঠন করে চলে গেছে আবার কখনও বিজেতারা এ দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেছে। এই বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারার কারণ অনুসন্ধান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর মতে প্রথম কারণ ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্খা রহিত," এবং দ্বিতীয়, "হিন্দু সমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি হিতৈষার অভাব।" এছাড়া ভারতবর্ষে জীবিকা সহজলভ্য, তাই ভারতবাসীরা কিছুটা অন্তর্মুখী, তারা কবি, দার্শনিক — বাহ্যসুখে তাদের অনাস্থা। তাদের সাহিত্যে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন; 'তাহাদিগের বিবেচনায় যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি ? স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা উভয় সমান।'

'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলছেন, 'জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।' ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্যের অভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন।

"এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে নানা জাতি। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই।"

তবে বঙ্কিমের মতে ভারতে কখনোই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ছিলনা একথা ঠিক নয়। আর্যরা যখন এদেশে এসেছিল তখন তাদের মধ্যে ঐক্য বিরাজ করত। কিন্তু পরে আর্যবংশ বিস্তৃত হলে ভারতের নানা অংশে তারা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে ভাষাগত ও ধর্মীয় বিভেদ দেখা দেয়। এর ফলে পূর্বের ঐক্য, এক জাতীয়ত্ব আর বজায় থাকেনি। বাইরের কোন্ আক্রমণেই ভারতবাসী তার ভাষাভেদ, বংশভেদ বা জাতিভেদ ভুলতে পারেনি। তাই সম্মিলিতভাবে একজাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি।

অবশ্য এর দুটি ব্যতিক্রম ছিল। শিবাজীর অধিনায়কত্বে মারাঠাজাতি ও রঞ্জিত সিংহের অধিনায়কত্বে শিখজাতি।

জাতীয়তাবাদের ধারণাটি যে ইংরেজদেরই অবদান সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর ভাষায় — "ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। . . . . . সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভান্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম — স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিতনা"।

ইউরোপে রেনেসাঁস এর প্রভাবেই জাতীয়তা বোধের উন্মেষ ঘটে বলে বঙ্কিমের ধারণা। ভারতবর্ষেও রেনেসাঁস-এর প্রবর্তনের ফলেই ভাষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনের পথ ধরেই জাতীয় উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে সচেষ্ট হন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ঐসময় ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে (একধরণের উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতা ও) দেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার মানসিকতা দেখা দেয়? (ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন স্মর্তব্য)। বঙ্কিমচন্দ্র এই অন্ধ পরাণুসরণকারী বাঙালীমানসকে স্বদেশীয় সাহিত্য সংস্কৃতির অভিমুখী করতে চাইলেন। তিনি জাতীয় জীবনের ঐক্যসাধনে বাংলা ভাষার উন্নতিবিধানের জন্য সোচ্চার হন। তিনি সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর পক্ষপাতী ছিলেন ঠিকই কিন্তু একথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে ইংরেজীর মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের আশা-আকাঙ্খা ব্যক্ত করতে অক্ষম এবং বিদেশী ভাষা জাতীয় ঐক্যেরও অন্তরায়।

জাতীয়তাবাদী চিন্তার পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনাচিন্তা মূলত বাংলাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিল বটে; কিন্তু প্রাদেশিক সংকীর্ণতা কখনও তাঁর রচনাকে কলুষিত করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে অভিহিত করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিন্তার উন্মেষ ঘটে এবং ইতিহাস-সন্ধান, সমাজ-চেতনা, মূল্যবোধের পরিবর্তন প্রভৃতির স্বাভাবিক পরিণামই হ'ল গভীর দেশাত্মবোধ যা বঙ্কিম চন্দ্রের রচনায় এক সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। "মৃণালিনী" উপন্যাসেই সর্বপ্রথম আমরা স্বদেশ-ভাবনা ও জাতীয়তাবাদের আভাস দেখতে পাই। ঐতিহাসিক মিনহাজদ্দীন লিখিত সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বক্তিয়ার খিল্‌জীর বাংলাদেশ জয়-এর অতিরঞ্জিত কাহিনীর প্রেক্ষাপটেই এই উপন্যাস রচিত। এই অলীক কাহিনী প্রত্যাখ্যান করে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধ 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন "সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল।"

কমলাকান্তের রচনাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের "দেশপ্রেম উন্মত্ত কাবেগের মধ্য দিয়ে উদাও ঝঙ্কারে গীতিময় হয়েছে। বিশেষ করে 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীত'-এ।" এই রচনাগুলিতে বঙ্কিম দেশপ্রেমের সহজাত সংস্কারকে যুক্তি ও তথ্যের অবলম্বন থেকে মুক্ত করে নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বদেশ-প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান দেশকে জননীরূপে কল্পনা করা। কমলাকান্তের আর কোন দেবী নেই

দেশমাতৃকা ছাড়া, আর কোন পূজা নেই দেশপূজা ছাড়া। দেবী দুর্গাকে বঙ্কিম দেশজনীনরূপে কল্পনা করেছেন। কমলাকান্তের কথায় —

'চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি — এই মৃন্ময়ী-মৃত্তিকারূপিনী - অনন্তরত্ন ভূষিতা — এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমন্ডিত দশভূজ — দশদিক — দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তিশোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়ণে নিযুক্ত!'

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবটির সূচনা এখান থেকেই। আনন্দমঠের সন্তানদের দেশমাতৃকার মূর্তিও ঐশ্বর্যময়ী, বলিষ্ঠভাবের উদ্দীপক। এই উপন্যাস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। পূর্বে রচিত 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি বঙ্কিম আনন্দমঠে যথাযোগ্য ভাবে সন্নিবেশিত করেন। এই সংগীত ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিপ্লবীদের প্রেরণার প্রধান উৎস হয়ে ওঠে, 'বন্দেমাতরম', শব্দটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীজমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। বহুবিপ্লবী বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহন্ করেছিলেন। আনন্দমঠের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র পরবর্তীকালে বাংলার বিপ্লবীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। 'অনুশীলন দল' - এর নামকরণ হয়েছিল বঙ্কিমের 'অনুশীলনতত্ত্ব' থেকে। বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ একসময় 'আনন্দমঠের' অনুকরণে ভবাণী মঠ গঠন করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তবাদের সংকীর্ণতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কারণ জাতীয়তাবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল বিভিন্ন জাতির স্বার্থকে পৃথকরূপে বিবেচনা করা। দুটি জাতির মধ্যে সংঘাত বা বিরোধ দেখা দিলে উভয়েই অপরের ক্ষতিসাধন করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু বঙ্কিম চেয়েছিলেন জাতি ধর্ম ও বর্ণের সমমর্যাদা ও সমানাধিকার। সকল মানুষের সার্বিক মঙ্গলই ছিল তাঁর কাম্য। পাশ্চাত্য দেশপ্রেমের ভাবনাকে তাই তিনি মেনে নিতে পারেননি —

''ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎর্পয্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব। কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য-ধর্ম না লিখেন।''

জাতীয়তাবাদকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক পটভূমিতে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণ করা যার মূলভিত্তি ভারতীয় মূল্যবোধ — কিন্তু সেই মূল্যবোধ যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কুসংস্কার মুক্ত এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র মূলত ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনা করেছেন 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে। বঙ্কিম যে জাতীয় সংস্কৃতির ভাবনা ভেবেছেন তার মর্মস্থল হল ধর্ম। কিন্তু ধর্ম বলতে তিনি বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে বোঝাননি। 'ধর্ম' হ'ল সেই সত্য যা সকল সম্প্রদায়ের Religion এর মূল ভিত্তি। সিলীর Ecce Homo গ্রন্থে যীশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্বের অস্বীকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। "The substance of religion is culture" — এই তত্ত্বটি তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' নির্মাণে ব্যবহার করেছিলেন। বঙ্কিমের মতে মহাভারতে আমরা যে কর্মবীর কৃষ্ণকে পাই তিনিই হচ্ছেন মানবতার পূর্ণ আদর্শ।

বঙ্কিমের মতে জীবনের কর্মময় বিকাশেই সংস্কৃতির বিকাশ। অনুশীলন বলতে কর্মপ্রচেষ্টাকেই বোঝায়। মানবিক বৃত্তিগুলির সম্যক অনুশীলন ও সামঞ্জস্যময় স্ফুরণের মধ্যেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ নিহিত। যুক্তিবাদী চিন্তার সাহায্যে সে আদর্শকে বঙ্কিম প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে। তিনি কৃষ্ণচরিত্রে কোন অলৌকিকতাকে স্থান দেননি। তাঁর অভিপ্রেত 'আদর্শপুরুষ' হিসেবেই কৃষ্ণকে উপস্থিত করেছেন বঙ্কিম। তাঁর চিন্তায় ভারত সংস্কৃতি হ'ল গতিশীল ও যুগোপযোগী। তাঁর আদর্শে হিন্দুত্বের বিশিষ্ট রূপটি লুপ্ত হয়নি। হিন্দুধর্মের যে সত্য, সে অন্যকে তিরস্কৃত করে না, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নেয়। এইখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির ঔদার্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।

৩৯.৬ বঙ্কিমচন্দ্র ও সাম্য

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার কয়েকটি প্রবন্ধ এবং ''বঙ্গদেশের কৃষক' নামে প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধের কিছু অংশ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৯ সালে 'সাম্য' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ''বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে অন্তর্ভুক্ত করলেও 'সাম্য' প্রবন্ধটি আর ছাপেননি।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক তত্ত্বে সামাজিক সাম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। বঙ্কিমপূর্ববর্তী বাংলার সারস্বত পরিমন্ডলে সাম্যচিন্তার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। রামমোহনের রচনাগুলিতে বেথাম ও মঁতেসফিউ-এর সাম্যচিন্তার প্রভাব পড়েছিল। একইভাবে রুশোর সাম্যচিন্তার প্রভাব ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণারঞ্জণ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, লালবিহারী দে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের দুঃখ দুর্দশার করুণ চিত্র তুলে ধরেছিলেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকরা সাম্যকে মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্য ও অসাম্যের সমস্যাটিকে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি সামাজিক সাম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর অর্থনৈতিক সাম্যকে সামাজিক সাম্যের অংশ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ''সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ''।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাম্য আলোচনায় তিনজন পথপ্রদর্শকের অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এঁরা হলেন বুদ্ধ, যীশু ও রুশো। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে যে সমৃদ্ধি ঘটেছিল বঙ্কিম তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। বুদ্ধের সাম্য ও অহিংসার বাণী বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল। যীশুখৃষ্ট ক্রীতদাসদের শৃঙ্খলমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সকল মানুষকে ভালবাসার বাণী শুনিয়েছিলেন। অপরদিকে রুশো প্রচার করেছেন, সাম্যই প্রাকৃতিক নিয়ম, সমাজভুক্তদের সম্মতিতেই সমাজের সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র রুশোকেই সাম্য ও সমাজবাদের জনক বলে অভিহিত করেন।

রুশোর সাম্যচিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য 'প্রাকৃতিক নিয়ম'-এর বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র রুশোকে অনুসরণ করে লিখেছেন যে প্রাক-সভ্যযুগে প্রাকৃতিক অবস্থায় সব মানুষই ছিল সমান। সভ্যতার বিস্তৃতির ফলে বৈষম্য দেখা দেয়। তাই রুশোর মতে সভ্যতা হ'ল মানুষের অমঙ্গলের কারণ। Le contract social গ্রন্থে উল্লিখিত রুশোর চুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বঙ্কিম বলেছেন যে, নিয়মাবলী তৈরী করে যেমন কোম্পাণী গঠিত হয়, তেমনি সমাজ, রাজ্যশাসন ইত্যাদির পিছনে থাকে এক সামাজিক চুক্তি। রাজা প্রজাসাধারণের মঙ্গলসাধনে ব্যর্থ হলে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। তাই তাঁর মতে ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি ও "মনুষ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ" হ'ল তার মূলে ছিল রুশোর মর্মবাণী। তবে বঙ্কিমচন্দ্র মোটেই রুশোর অন্ধভক্ত ছিলেন না। তাঁর মতে রুশো "অবিমিশ্র বিমল সত্য" প্রচার করেননি। 'তিনি মহিমময় লোক হিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি দিয়া ফরাসীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।" বঙ্কিম আরো লিখেছেন, "ভূমি সাধারণের — এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন। তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। 'কম্যুনিজম' সেই বৃক্ষের ফল। 'ইন্টার ন্যাশনাল' সেই বৃক্ষের ফল।" 'কম্যুনিজম' ও 'ইন্টারন্যাশনাল' কথা দুটির উল্লেখ করলেও বঙ্কিম মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর মতবাদসমূহের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাননি কারণ তাঁদের রচনা তখন এদেশে সহজলভ্য ছিলনা।

'সাম্য' গ্রন্থে বঙ্কিম মাঁ সিঁমো, প্রুধো, রবার্ট ওয়েন, শার্ল ফ্যুরিয়ের, লুই ব্লাঁ প্রমুখের সাম্যবাদী চিন্তার উল্লেখ করেছেন। এঁদের সম্পর্কে অবহিত থাকলেও বঙ্কিম বিশেষভাবে গুণগ্রাহী ছিলেন ইংরেজ উদারতন্ত্রী আদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল-এর। মিল রচিত 'Principles of Political Economy, 'On Liberty', 'On the Subjection of Women' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্কিমকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ ও নৈতিকতার উন্নয়ণ — মিলের চিন্তার এই দুটি দিকই তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। মিল যেমন ভেবেছিলেন প্রচলিত ব্যবস্থাদির সংশোধনের মধ্য দিয়ে মানবজাতির প্রকৃত উন্নয়ণ সম্ভব। বঙ্কিম ও তেমনি ভাবতেন গুরুতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের আধিক্যগুলি ব্যক্তির সদিচ্ছার মধ্য দিয়ে নৈতিকতার বোধ জাগিয়ে তুলে দূর করা সম্ভব। মানবিকতা তত্ত্বের উদ্গাতা মিল 'Utilitarianism' গ্রন্থে বলেছেন, সামঞ্জস্যের অভাবেই দুঃখ আসে, অনুশীলনের মধ্য দিয়েই সেই দুঃখ অতিক্রম করা যায়। সমাজের সুষ্ঠু বিধানে, ব্যক্তির শুভবুদ্ধিতে সবই করা যায় — শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষার সম্যক অনুশীলনই মানুষের পূর্ণতালাভের একমাত্র পথ। বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্বে এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে আমরা মিলের চিন্তার প্রতিধ্বনিই শুনতে পাই।

সাম্যতত্ত্বের সাধারণ তাৎপর্য বর্ণনা করে বঙ্কির্মচন্দ্র লিখেছেন —

"মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু একথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যই সকল-অবস্থার সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান। নৈসর্গিক তারতম্য আছে। কেহ দুর্বল, কেহ বলিষ্ঠ, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ

বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিবে। যে বুদ্ধিমান এবং বলিষ্ঠ, সে আজ্ঞাদাতা; যে বুদ্ধিহীন এবং দুর্বল সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে। . . . . . কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিক বৈষম্য, নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যেসকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলির সংশোধন না হইলে, মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি নাই। . . . . . কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বলিয়া কেহ না মনে করেন যে, আমি জন্মগুণে বড়লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগুণে ছোটলোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চকূলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে। অন্য যে নীচ কুলে জন্মিয়াছ, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচ কুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইওনা; মনে থাকে যেন সেও তোমার ভাই— তোমার সমকক্ষ।''

বঙ্কিমচন্দ্র জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের প্রজাপীড়ন বিষয়ে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর বিরোধিতা করে তিনি লিখেছেন। ''জমিদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের মধ্যে প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লেখা হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমিদারেরা কস্মিন্ কালে কেহ নহেন কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস্ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। . . . . . এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র . . . . . '' সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট জামিদারদের অত্যাচার পীড়নের সঙ্গে সঙ্গে লোভী মহাজনদের নির্মম শোষণ যুক্ত হওয়ায় কৃষকদের অবস্থা হয়েছিল অবর্ণনীয়। আবার জমিদারদের অগোচরে বেতনভোগী নায়ের গোমস্তারাও নির্যাতন করত তারও বাস্তব বিবরণ দিয়েছেন বঙ্কিম। তবে তিনি জমিদারদের সমালোচনার পাশাপাশি একথাও উল্লেখ করেছেন, ''সকল জমিদার অত্যাচারী নহেন।''

বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় 'নিরানব্বই ভাগ'ই কৃষক। তাই পরাণ মন্ডল, হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত প্রভৃতির মত কৃষক যারা জমিদারের শোষণ ও সামাজিক দুর্গতির শিকার তাদের অবস্থার উন্নতি না হলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। জমিদারদের দৌরাত্ম্য, শোষণের কারণ, বৈষম্যের সূত্র, সামাজিক বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে ভারতে সংস্কার প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমাজে ধনসঞ্চয় থেকেই, শ্রমবিন্যাস ও সামাজিক অসাম্যের সূত্রপাত। সমাজ 'শ্রমোপজীবী' ও 'বুদ্ধ্যপজীবী' এই দুইশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জ্ঞানান্বেষী বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষা ও যোগ্যতার গুণে সমাজে প্রাধান্য পায় আর শ্রমজীবীরা তাদের বশবর্তী হয়ে শ্রম করে। উৎপাদনের প্রথম ভাগ অর্থাৎ মজুরির দরুণ বেতন পায় শ্রমজীবী। আর মুনাফা নামে দ্বিতীয় ভাগটির অধিকারী হয় বুদ্ধিজীবী। শ্রমজীবী সংখ্যায় যতই গরিষ্ঠ হোক না কেন মুনাফার কোন অংশ তারা পায়না। ফলে অসাম্যের বৃদ্ধি ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন লোকসংখ্যার বৃদ্ধিও অসাম্যের অন্যতম কারণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে তিনি বিবাহ প্রবৃত্তি দমনের প্রস্তাব করেন। অসাম্যের তিনিটি কার্যকারণ প্রক্রিয়ার কথা বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন—

১। (ক) শ্রমের বেতনের অল্পতা; নামান্তর দারিদ্র্য যার ফলে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

(খ) পরিশ্রমের আধিক্যে অবকাশে ধ্বংস, অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। ফল মূর্খতা— এও বৈষম্যবর্দ্ধক।

(গ) বুদ্ধিজীবীদের প্রভুত্ব ও অত্যাচার। নামান্তর দাসত্ব। এটা বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা।

সুতরাং মোট ফল দারিদ্য, মুর্খতা, দাসত্ব।

২। প্রকৃতির আনুকূল্যে ভারতীয়রা কায়িক সুখে পরাঙমুখ। আলস্য, শ্রমে অনীহা ও উদ্যমহীনতা তাদের প্রবল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ঐহ্যিক সুখে মানুষ ছিল নিস্পৃহ। তাই সামাজিক অসাম্য ধারাবাহিক।

৩। (ক) উৎপাদনের অনগ্রসরতার ফলে বানিজ্যের হানি।

(খ) বৈষম্য পীড়িত নিম্নবর্ণের লোকেরা নিস্তেজ। নম্র, অনুৎসাহী ও অবিরোধী, তাই রাজপুরুষেরাও দুর্বল। তাই ভারত বারেবারে বিদেশীদের কাছে পদানত হয়েছে।

(গ) শ্রমজীবীদের চিরস্থায়ী দুরবস্থা সারা সমাজের অবনতির কারণ ঘটায়। বঙ্কিমের ভাষায়, "যেমন এক ভান্ত দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনই সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দশা জন্মে।"

ধণী ও দরিদ্রের চিরন্তন অসাম্যের সমস্যাটি বঙ্কিম ব্যঙ্গবিদ্রুপের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন কমলাকান্তের অন্তর্গত 'বিড়াল' প্রবন্ধে।

'সাম্য' গ্রন্থের পঞ্চম ও শেষ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজে নারীর অধঃস্থ ভূমিকা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সব মানুষের সমান অধিকার। নারীও মানুষ, অতএব "পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায় সঙ্গত।" স্ত্রী-পুরুষের যে সমস্ত সামাজিক বৈষম্যের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তা হল ঃ (ক) শিক্ষার সুযোগ, (খ) বিধবাদের পুনর্বিবাহের স্বাধীনতা, (গ) পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং (খ) পুরুষদের বহুবিবাহের অধিকার। এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যখন আমরা নারীর অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন আন্দোলন, তর্কবিতর্ক গড়ে তুলছি, তখন বিস্মিত হতে হয় প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র কী তীব্রভাষায় পুরুষশাসিত সমাজের নিয়মনীতির বিরুদ্ধে কশাঘাত হেনেছিলেন —

" . . . . . জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্তিনী হয় ইহা বড় বাঞ্ছনীয়, পুরুষগণ স্ত্রী জাতির বশবর্তী হয় ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছে, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র ? না রজ্জুটি পুরুষের

হাতে বলিয়া স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন ? ইহা যদি অধর্ম না হয়, তবে অধর্ম কাহাকে বলে বলিতে পারি না।" বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন নারীকেও তাঁর আদর্শেই চিত্রিত করেছেন। তাঁরা সকলেই স্বাতন্ত্র্যবোধে, দুঃসাহসিক কর্মে, উপস্থিত বুদ্ধিতে, তেজস্বীতায় এবং ব্যক্তিত্বে অনেক সময়ই পুরুষকে অতিক্রম করে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাত্মক সাম্যের কথা বলেছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য সাম্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং সাম্য সংক্রান্ত অন্যান্য রচনাগুলি প্রকাশিত হতে থাকলেও 'সাম্য' গ্রন্থটি তিনি আর পুনর্মুদ্রিত করেননি।

৩৯.৭ সারাংশ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে এক গঠনশীল ভাবনা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য যুক্তবাদী চিন্তা, মানবতাবাদ, আধুনিক সভ্যতার শক্তি ও সম্পদ বঙ্কিমকে আকৃষ্ট করেছিল। একই সঙ্গে বঙ্কিম ছিলেন সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। আজন্ম হিন্দু সংস্কার লালিত এবং সমাজের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। জন স্টুয়ার্ট মিল, স্পেন্সার, কোঁৎ, রুশো এবং ইউটোপীয় সমাজবাদদের ধ্যান-ধারণাকে তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার একই সঙ্গে প্রভাবিত হয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কালের অসংখ্য যুগান্তকারী প্রতিভার দ্বারা। সরকারী চাকরীসূত্রে বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত থাকায় বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছাকাছি আসার অভিজ্ঞতাও হয়েছে তাঁর।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ইংরেজীতে প্রকাশিত Rajmohans' Wife. কিন্তু তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'ই তাঁকে সাহিত্য সম্রাটের আসনে উপস্থাপিত করে। বঙ্কিমরচিত প্রায় সব উপন্যাসগুলিই রোমান্সধর্মী, বেশ কয়েকটি পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত আবার কয়েকটি বিশেষবাবে ইতিহাস-আশ্রিত। তবে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে কারণ এই উপন্যাসে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রখর দেশভক্তি ও গভীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় পাই। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের বৈপ্লবিক রূপ এই উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়েছে। বিপ্লবীদের মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' এই উপন্যাসেই যুক্ত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে বঙ্কিমের নিজের লিখিত এবং সমকালীন বিদগ্ধ লেখকদের রচিত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হত।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রবল দেশপ্রেম থেকেই তিনি ইতিহাস চর্চা শুরু করেন এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি, শাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়ণ করতে থাকেন। তিনি এর মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই জাতীয়তাবোধের ধারণা ইংরেজদের অবদান হলেও তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে এমন একটা জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে যার মূল

ভারতের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে প্রোথিত, অথচ যা উদার ও কুসংস্কারমুক্ত।

বঙ্কিম সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনাটিতে তিনি ভূমিসমস্যা ও কৃষকদের অত্যাচার ও বঞ্চনা এবং জমিদার ও মহাজনদের শোষণের কাহিনী বিশ্লেষণ করেছেন। কমলাকান্তর বিভিন্ন রচনায় ব্যঙ্গবিদ্রুপের কশাঘাতে তিনি সমকালীন সমাজের বিভিন্ন চিত্র এঁকেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের বিকাশ যা সম্ভব অনুশীলনের মাধ্যমে। 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধদুটি তারই প্রমাণ। মানব ও সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরের সামঞ্জস্যের সাধনাই অনুশীলন যার মূলে আছে ঈশ্বরভক্তি। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রই বঙ্কিমের আদর্শ পুরুষ। কর্মবীর কৃষ্ণই হলেন এক সম্পূর্ণ মানুষ যাঁর মধ্যে ঘটেছে মানবতার পূর্ণ বিকাশ।

সারাজীবনের সাহিত্য ও কর্মসাধানায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রীতির মাধ্যমে এই মানবতার উত্তরই চেয়েছিলেন তাই তাঁর রচনাগুলি আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

৩৯.৮ অনুশীলণী

১। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতি ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে কি অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা উপস্থাপিত করুন।

২। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ণ করুন।

৩। সামাজিক সাম্য বলতে বঙ্কিমচন্দ্র কি বুঝেছিলেন? অসাম্য ও তার কারণ এবং তা দূর করার জন্য বঙ্কিম কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন ?

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। বঙ্কিমপূর্ব ও সমকালীন ঘটনাবলীর দ্বারা বঙ্কিমমানস কিভাবে প্রবাবিত হয়েছিল — বিশ্লেষণ করুন।

৩৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৭৩

২। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (প্রথম খন্ড), ১৯৯১

৩। ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত) ঃ বঙ্কিমচন্দ্র ঃ আধুনিক মন, ১৯৮৯

৪। দেবাশিস চক্রবর্তী ঃ ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা, ১৯৯৭

৫। Amal Kumar Mukhopadhyay : The Bengali Intellectual Tradition, 1979

একক ৪০ □ শ্রী অরবিন্দ

গঠন

৪০.০ উদ্দেশ্য
৪০.১ প্রস্তাবনা
৪০.২ সংক্ষিপ্ত জীবনী
৪০.৩ অরবিন্দ ও চরমপন্থী আন্দোলন
৪০.৪ আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ
৪০.৫ অরবিন্দের রাষ্ট্রদর্শন ঃ রাষ্ট্র ও ব্যক্তি
৪০.৬ অরবিন্দের শিক্ষাচিন্তা
৪০.৭ সারাংশ
৪০.৮ অনুশীলণী
৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে আলোচিত হবে :

- চরমপন্থী আন্দোলনে শ্রী অরবিন্দের ভূমিকা;
- তাঁর ভাবনায় আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার সমন্বয়;
- রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ণ এবং;
- শিক্ষা সম্পর্কে অরবিন্দের চিন্তাভাবনা;

৪০.১ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অংশে কিছু ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের রাজনৈতিক চিন্তায় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের তত্ত্বটি রূপ পায়। ক্রমশ এই তত্ত্বটিকে অবলম্বন করে নানা স্তরের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিকাশ এই চিন্তাধারা গড়ে ওঠায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এই আন্দোলকে 'জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন' এবং এই ধারার সঙ্গে যুক্ত নেতা ও কর্মীদের 'চরমপন্থী বলে আখ্যায়িত করা হয়। উদারনৈতিক নরমপন্থীদের নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের সোচ্চার প্রতিবাদ ও সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন গতি সঞ্চার করে। চরমপন্থী চিন্তাধারার প্রভাবে মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব এবং বাংলার বিপ্লবী ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করে। মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর

তিলক, পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায় এবং বাংলাদেশে বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন এই চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। এঁরা সকলেই বৈদিক যুগ, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বকীয় বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটির নাম শ্রী অরবিন্দ, যিনি শুধু ভারত নয় বিশ্বের আধুনিক চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচন করে গেছেন। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইতালী ও আয়ার্ল্যান্ডর মুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। যোয়ান অব আর্ক ও মাৎসিনী ছিলেন তাঁর আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দের মানব দর্শন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রচিন্তা তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল।

শ্রী অরবিন্দের চিন্তার মূল উৎস অধ্যাত্মবাদ হলেও সমাজ ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তিনি স্বচ্ছ, বাস্তব ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে আলোচনা করেছেন। সাংবিধানিকও আপোষমূলক কর্মপদ্ধতির পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক কর্মপন্থার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। অরবিন্দ বিভিন্ন সময়ে জাতীতাবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা করেছেন; শিক্ষা সম্পর্কেও তাঁর মৌলিক চিন্তা ভাবনা ছিল। আমরা পর্যায়ক্রমে এই বিষয়গুলি আলোচনা করব।

৪০.২ সংক্ষিপ্ত জীবনী

অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী অরবিন্দ ১৮৭২ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন একজন খ্যাতনামা ডাক্তার। মাতামহ শ্রী রাজনারায়ণ বসু বিদগ্ধ পুরুষ ও জাতীয় ভাবাপন্ন এক বরেণ্য নেতা। ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতার উন্নতিতে রাজনারায়ণ বসুর অবদান ছিল অসামান্য। বাল্যকালে অরবিন্দ ঘোষ তাঁর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, সেই কারণে পুত্র অরবিন্দের দার্জিলিং সেন্ট পল্‌স্ স্কুলে শিক্ষার সুরু। বছর দুয়েক পর কৃষ্ণধন সপরিবারে বিলাত যাত্রা করেন।

১৮৯০ সালে অরবিন্দ মাত্র আঠার বছর বয়সে আই-সি-এস পরীক্ষা দিলেন। এই পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অশ্বারোহণে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ না হয়ে তিনি সার্ভিসে যোগদান করেননি। এরপর তিনি কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে অধ্যয়ণ করেন। ১৮৯২ সালে অরবিন্দ ক্লাসিক্‌সের ট্রাইপোসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই সময় থেকেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। কেম্ব্রিজের ভারতীয় মজলিশে তিনি রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা Lotus and Dagger এর সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

প্রায় চোদ্দ বছর তিনি প্রবাসে কাটান। গ্রীক, লটিন্ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বরোদা রাজ্যে প্রথমে প্রশাসনিক কার্যে এবং পরে বরোদা কলেজের সহ-অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কলেজে অরবিন্দ ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। এই সময়

অরবিন্দ ছিলেন খাঁটি সাহেব; বেশভূষা। চাল-চলন, কথাবার্তা সবেতেই তাঁর ওপর ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ। কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভারতীয়। বরোদায় থাকাকালীন ভারতীয় সাহিত্যে, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন সবই অরবিন্দ আত্মস্থ করেছিলেন। তিনি প্রায় বারো বছর বরোদায় ছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল অরবিন্দের জীবনে এক মাহেন্দ্রযুগ বলে অনেকে মনে করেন। এই সময় তিনি বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, গীতা, পুরাণ সবকিছুই অধিগত করেছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে স্বদেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য আত্ম সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় অরবিন্দ 'New Lamps for Old' শীর্ষক প্রবন্ধমালা লিখতে শুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রচিন্তার দ্বারা তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ'-এর আদর্শে তিনি ভবাণী মন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। অরবিন্দ ১৯০২ সাল নাগাদ একটি গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলে তাঁর বৈপ্লবিক তৎপরতার এই প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

১৯০৪ সালে বোম্বাই কংগ্রেসে যোগ দিয়েই অরবিন্দ প্রকাশ্য রাজনীতিতে অবতীর্ণ হলেন। এই সময় থেকেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে চরমপন্থীদের অস্তিত্ব স্পষ্ট হতে শুরু করে। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থীদের পুরোধা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিলেন যার জন্যে তিনি বরোদার সম্মাণীয় পদ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে যুক্ত হন এবং বাংলার বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বহু ছাত্র সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করেছিল। তাদের জন্য কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Educaiton) গঠিত হয় এবং অরবিন্দ তার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করেন।

১৯০৭ সালে মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনে অরবিন্দ কংগ্রেস জাতীয় দলের নেতা হিসেবে যোগদান করলেন। এখানেই প্রকাশ্যে নরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে জাতীয় দলের বিরোধ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একই বছরে সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং চরমপন্থীরা অরবিন্দের সভাপতিত্বে এক পৃথক সম্মেলনে মিলিত হন। ক্রমশঃ অরবিন্দ সারা ভারতের নেতা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

এরপর ১৯০৮ সালে রাজনৈতিক ডাকাতি ও গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রের নায়ক হিসেবে অরবিন্দ অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ হন। এটিই 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা' বলে খ্যাত। এই মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। দেশবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও বাগ্মিতায় প্রায় একবছর পর অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হন।

এই একবছরের কারাবাস অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে বিশেষ অনুকূল হয়েছিল। এই সময় 'ঐশ আদেশ' পেয়েছিলেন তিনি। এরপর তাঁর স্বদেশচিন্তায় ধর্মভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। দেশের সেবায় এই অধ্যাত্ম চেতনা জাগ্রত করার জন্য তিনি ইংরেজীতে 'কর্মযোগিন্' ও বাংলায় 'ধর্ম' নামে দুটি

পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। কর্মযোগ প্রচারই হ'ল তাঁর উদ্দেশ্য। জীবনে বেদান্ত ও যোগাদর্শ প্রয়োগই হ'ল কর্মযোগ।

১৯১০ সালে সকলের অলক্ষ্যে তিনি পন্ডিচেরী যাত্রা করেন। তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের এখানেই শেষ। ১৯১৪ সালে পন্ডিচেরী থেকে অরবিন্দ 'আর্য' নামে একটি ইংরেজী পত্রিকার প্রকাশন শুরু করলেন। বেদ-রহস্য, উপনিষদের ব্যাখ্যা, দিব্য জীবনের আদর্শ, ভারতের সংস্কৃতি, মানবসমাজের বিবর্তনের বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অরবিন্দ অসাধারণ পান্ডিত্য ও গভীর উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

১৯২৬ সালে পন্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই এই অনাড়ম্বর আশ্রমজীবনের উদ্দেশ্য। মৌলিক চিন্তা প্রসূত ও জ্ঞানগর্ভ যেসব গ্রন্থ অরবিন্দ রচনা করেছিলেন তার অধিকাংশই এই পর্বে অর্থাৎ সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেবার পর লিখিত। বিভিন্ন সময়ে রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'Life Divine', 'Savitri', 'Essays on the Geeta', 'Synthesis of Yoga', 'The Human Cycle', 'The Ideal of Human Unity' ইত্যাদি।

১৯৫০ সালে মহাযোগী শ্রী অরবিন্দের প্রয়াণ হয়। পন্ডিচেরীর আশ্রম-প্রাঙ্গণেই তাঁকে সমধিস্থ করা হয়।

৪০.৩ অরবিন্দ ও চরমপন্থী আন্দোলন

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কংগ্রেসের উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন ব্রিটিশ শাসনই ভারতকে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে পারে। আদি-পর্বে কংগ্রেসের নেতারা ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বশীলতাকে কাম্য বলে মনে করতেন। তাঁরা ভাবতেন ব্রিটেনের সংস্পর্শে এসে ভারত তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা থেকে মুক্ত হবে। ডব্লু. সি. ব্যানার্জী, দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শাহ্ মেহতা, গোবিন্দ রানাডে, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ছিলেন এই যুগের কংগ্রেস নেতা। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন বিত্তবান, জমিদার, পুঁজিপতি অথবা উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী। এঁরা সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক অগ্রগতি দাবি করেছিলেন। সর্বপ্রকার বিদ্রোহ বা সংঘাতমূলক কাজকর্মের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথকেই একমাত্র রাজনৈতিক পথ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা পশ্চিমী ধাঁচে সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মঞ্চের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে প্রশাসনিক সংস্কার আদায়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৯২ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট কংগ্রেসের দাবীগুলিকে রূপায়িত করেনি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসের অধিকার দাবী, ভারতীয় শিল্পের স্বার্থবিরোধী শুল্কনীতি ইত্যাদির সমালোচনা ব্রিটিশ শাসকেরা সুনজরে দেখেননি। ফলে এই পর্ব থেকেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়ে যায়। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের একাংশ কংগ্রেসের পদ্ধতির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। শুরু হয় বিকল্প মত ও পক্ষের সন্ধান।

ঊনিশ শতকের শেষভাগে মহারাষ্ট্রের দামোদরহরি চাপেকার কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেছিলেন, শুধুমাত্র বক্তৃতা দিয়ে কংগ্রেস ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ কংগ্রেসের সমালোচনা করে জানিয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রতি তাঁর কোন আস্থা নেই কারণ শুধুমাত্র কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে দেশের স্বাধীনতা আনা যায়না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সাহায্যে পরোক্ষে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ও 'বন্দেমাতরম্' কবিতা তৎকালীন যুবসমাজে বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রবীনন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই আবেদন-নিবেদন সর্বস্ব রাজনীতিকে কখনোই সমর্থন করেননি। আপোষকামী রাজনৈতিক নেতাদের ভিক্ষাবৃত্তি তাঁকে মর্মাহত করেছিল।

এই সময় থেকেই ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের অনমনীয় নীতির বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে চরমপন্থী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। এই চিন্তাধারার প্রভাব সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায় মহারাষ্ট্র, বাংলা এবং পাঞ্জাবে।

মহারাষ্ট্রে সংগ্রামী জাতীয় চেতনার জনক ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। নরমপন্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি গণ-আন্দোলনমুখী রাজনীতির প্রবর্তন করেছিলেন। ইংরাজী সাপ্তাহিক 'মারাঠা' এবং মারাঠী সাপ্তাহীক 'কেশরী'র মাধ্যমে যুবশক্তির মধ্যে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আদর্শ সঞ্চারিত করেছিলেন তিলক। শিবাজী উৎসব ও গণপতি উৎসব প্রবর্তন করে তিনি রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের যোগদানের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। ' হোমরুল' আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন তিলক।

পাঞ্জাবের চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন লালা লাজপৎ রায়। তিনি নরমপন্থী কংগ্রেস আন্দোলনকে ইংরেজী শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ভারতীয়দের বাৎসরিক অনুষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মতে এই উৎসব নেতাদের আত্মগরিমা ও বাগাড়ম্বর প্রকাশের মঞ্চমাত্র। তিনি স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। লাজপৎ রায় নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

বাংলাদেশে চরমপন্থী নীতি ও কর্মধারা প্রচার করেছিলেন মূলতঃ বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এঁরা সকলেই বৈদিক যুগ, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, নীতিশাস্ত্র এরং দেশীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপান্যাসের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত বিশেষ করে বাংলাদেশের সংগ্রামমুখী আন্দোলনকে উদ্দীপিত করেছিলো। অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'মাতৃবাদ' (Mother Cult) প্রচার করেছিলেন অরবিন্দ আনন্দমঠের আদর্শে ভবানী মন্দীর প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের চরমপন্থী আন্দোলনে অরবিন্দ ঘোষ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে

আছেন। বিলাত থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তণের পর তাঁর প্রথম রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় 'New Lamps for Old' প্রবন্ধ মামলায় তাঁর বক্তব্য প্রচার করা।

অরবিন্দ কংগ্রেসের আন্দোলন, কর্মপদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি কংগ্রেসকে 'একটি ব্যর্থ সংগঠণ' বলে অভিহিত করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে অরবিন্দই সম্ভবত প্রথম সমালোচক যিনি কংগ্রেসকে 'বিজাতীয়' ও 'জনসমর্থনহীন' প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে 'দুর্বল, ভীরু ও স্বার্থপর, ভন্ড এবং অন্ধভাবাচ্ছন্ন' বলে বর্ণনা করেছেন। অরবিন্দ লিখেছিলেন — "a body like the congress, which represents not the mass of the population, but a single and very limited class, could not honestly be called national." তাঁর মতে, উচ্চবিত্ত পরিচালিত কংগ্রেস জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূর করতে সক্ষম হবেনা।

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে সারা বিশ্বের সামন্ত্রতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনগুলি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে জাতীয় আন্দোলন নতুন চেতনার বিকাশ ও নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অরবিন্দ ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে, ইতালীর মুক্তি সংগ্রাম এবং আয়ারল্যান্ডের 'সিন্ ফিন্' আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

১৯০৪ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অরবিন্দ বিশিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী কংগ্রেস কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন এবং সুসংবদ্ধ কর্মসূচীভিত্তিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এবং বাংলার অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় একসাথে মিলিত হয়ে কংগ্রেসের নরমপন্থী মতাদর্শ ও কর্মসূচীর বিরুদ্ধে এক বিকল্প চরমপন্থী রাজনৈতিক পন্থা উদ্ভাবন করলেন।

১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী মতাদর্শের সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে। চরমপন্থীরা অধিবেশন ছেড়ে বেড়িয়ে এলেও তাঁদের চাপে চারটি বিষয়ে নরমপন্থীদের সম্মতি দিতে হয়েছিল। সেই চারটি বিষয় হ'ল— স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার ও বিদেশী বস্তু বয়কট। বিশেষ করে বয়কটের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব কংগ্রেসের নরমপন্থীদের দিয়ে অনুমোদন করানো চরমপন্থীদের পক্ষে এক বিশেষ সাফল্য সূচিত করেছিল।

এই বয়কট আন্দোলন ক্রমশঃ সারা ভারতে ছাড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে শ্রী অরবিন্দ বয়কটকে কেন্দ্র করে তাঁর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) এর তত্ত্ব রচনা করেন। অরবিন্দর মতে, বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধ তিনটি পন্থা অবলম্বন করতে পারে — নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance), আগ্রাসী প্রতিরোধ (Agressive Resistance), এবং সশস্ত্র বিপ্লব (Armed Revolt)। একটি পরাধীন জাতি তার স্বাধীনতা অর্জনে জন্য উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির কোনটি অবলম্বন করবে তা নির্ধারিত হয় তার দাসত্বের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' তিনটি মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, অন্যান্য এবং দমনমূলক কোন আইন লঙ্ঘন করা শুধুমাত্র সমর্থনযোগ্য নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তা অবশ্যকর্তব্যও বটে। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য প্রশাসনিক নির্দেশ এবং বলপূর্বক (Coercive) হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সঙ্গত ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং তৃতীয়ত, বিদেশী দ্রব্য বর্জন করা, বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বর্জন করা এবং স্বৈরাচারী ন্যায়নীতিহীন সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করা একান্ত কাম্য।

অরবিন্দ বলেছিলেন, ভারতীয়রা যদি সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান করতে, সরকারী অফিসে চাকরী করতে এবং বিদেশী পুলিশকে মান্য করতে অসম্মত হয় তাহলে বিদেশী প্রশাসনের পক্ষে আর একদিনও কাজ চালানো সম্ভব হবে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন অরবিন্দের 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের' ধারণার সঙ্গে গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহের' ধারণার পার্থক্য অনেকটাই। অহিংসা গান্ধীজীর মূলমন্ত্র, কিন্তু 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ভিত্তি অহিংসা নয়।

অরবিন্দ ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বয়কটকে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও বিদেশী অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষার প্রশ্নেও নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। স্বদেশী বয়কট আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিল বাংলার ছাত্র-যুবসমাজ। ব্রিটিশ শাসক ছাত্রদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করাকে অপরাধ বলে ঘোষণা করে, 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরীক্ষা বর্জন করে। ছাত্র আন্দোলন যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায় সেইজন্য নরমপন্থী নেতারা বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় উদ্যোগী হলেন।

১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী অরবিন্দ। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সংগ্রাম-বিমুখ পরিচালনা ব্যবস্থা এবং পাঠ্যসূচীকে অরবিন্দ মেনে নিতে পারেননি ফলে তিনি শ্রীঘ্রই কলেজের সঙ্গে সকল সংশ্রব ত্যাগ করেন।

অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলেন। ব্রিটিশ শাসনের অবসানই যে মুক্তির একমাত্র পথ সেকথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেছিলেন।

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সাফল্যে নরমপন্থী নেতারা ভীত হয়েছিলেন এবং ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে চরমপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করতে প্রয়াসী হলেন। বিতর্কিত খসড়া প্রস্তাব এবং সভাপতি পদের জন্য মনোনয়ন ঘিরে অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই তীব্র বাদানুবাদ ও ধস্তাধস্তি শুরু হয় এবং অবশেষে অধিবেশন ভন্ডুল হয়ে যায়। নরমপন্থীরা পরে পৃথক সম্মেলন করেন। অপরদিকে চরমপন্থীরাও

স্বতন্ত্র একটি সভায় ১৯০৬ সালের প্রস্তাবগুলি পুনরায় অনুমোদন করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী-অরবিন্দ। পরবর্তী একবছরের মধ্যেই নরমপন্থীরা চরমপন্থীদের সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করে কংগ্রেসে নিজেদের আধিপত্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন।

৪০.৪ আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ

শ্রী অরবিন্দের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণা। ভারতবর্ষকে তিনি যে একটি জাতি হিসেবে কল্পনা করেছিলেন তা উদ্ভূত হয়েছিল তাঁর জাতীয়তাবাদ ও জাতি-আত্মার (Nationalism and Nation-soul) ধারণা থেকে।

জাতীয়তাবাদকে শ্রী অরবিন্দ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করেননি। জাতীয়তাবাদের বস্তুগত ভিত্তির উপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থপূরণের মধ্য দিয়েই আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয় — অন্যথায় কখনোই একটি জাতি গড়ে উঠতে পারেনা একথা অরবিন্দ বিশ্বাস করতেননা। তাঁর মতে, একটি জাতি তখনই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে যখন তার মধ্যে জাতীয় আত্মা জাগ্রত হয়। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি ধাপ হল জাতীয়তা। জাতীয়তাবাদকে অরবিন্দ নিছক দেশাত্মবোধের দৃষ্টিতে দেখেননি। তার পশ্চাতে তিনি এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সাধনার চিন্তা পোষণ করতেন। তিনি লিখেছিলেন "জাতীয়তা একটা রাজনীতিক কর্মপদ্ধতি নহে, জাতীয়তা ভগবানসম্ভূত ধর্ম। জাতীয়তা কখনই বিনষ্ট হইবে না। . . . . . ভাগবৎ শক্তিতেই জাতীয়তা টিকিয়া থাকিবে। যে কোন প্রকার অস্ত্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হউক না কেন, জাতীয়তা অমর, কারণ ইহা মানবীয় জিনিস নহে . . . . . ।"

অরবিন্দ তাঁর দেশবাসীকে নিজের জাতির বিশেষ গৌরবের প্রতি সজাগ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর একাধিক রচনায় ও বক্তৃতায় তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন ভারতবর্ষের মহান আদর্শ ও ঐতিহ্যের কথা। তিনি ভারতবর্ষকে দেখেছেন পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম ও উন্নততম সভ্যতা হিসাবে। ভারত ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করেই তিনি নির্মাণ করেছিলেন এই মহান ভারতবর্ষের ধারণা। দেশ ও তার অধিবাসীদের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের সন্ধান করেছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের এই সংমিশ্রণ চিন্তাকে হিন্দু পুনর্জাগরণ প্রয়াস বলে মনে করেন। শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবর্ষের মহত্ত্ব ঈশ্বরের মহত্ত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

অরবিন্দ বলেছিলেন পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অন্যান্য দেশের মত কেবলমাত্র পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার। শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন নির্মাণ, সামরিক শক্তি অর্জন, রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং এই সবের সাহায্যে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উপর প্রভূত্ব করা কখনোই ভারতবর্ষের

৪০.৫ অরবিন্দের রাষ্ট্র দর্শন ঃ রাষ্ট্র ও ব্যক্তি

শ্রী অরবিন্দ সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন — ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও মানবসমাজ, এগুলির প্রতিটি অপরের আনুকূল্যে নিজ পথে বিকশিত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক প্রবণতায় ব্যক্তি তার জীবনের বাহির ও অন্তরকে গোষ্ঠীর সাহায্যে বিকশিত করে আবার গোষ্ঠীও ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর মানবসমাজে মিশে যায়। একদিকে ব্যক্তিমানুষ ও অপরদিকে বৃহত্তর মানবসমাজ গোষ্ঠীকে পরিপুষ্ট করে।

শ্রী অরবিন্দের মতে রাষ্ট্র হ'ল সংগঠিত জনসমাজ যার জন্য ব্যক্তি সবসময়ই স্বার্থত্যাগ করছে। রাষ্ট্র চায় ব্যক্তির অধিকার হরণ করে গোষ্ঠীর যূপকাষ্ঠে তাকে বলি দিতে। বস্তুতঃ রাষ্ট্র বা সামগ্রিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তি স্বার্থের নতিস্বীকার আসলে কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থের কাছে নতিস্বীকার। বর্তমান রাষ্ট্রে ক্ষমতাশীল দল বা শ্রেণী জনগণের আশা আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে না, রাষ্ট্রের যান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক পরিবেশ দেশের শ্রেষ্ঠ মনন ও চিন্তনের কোন চিহ্নই দেখা যায়না। তাঁর মতে রাষ্ট্র সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনতো করেই না বরং সঙঘবদ্ধভাবে ক্ষতিসাধন করে।

অরবিন্দ রাষ্ট্র সম্পর্কে জৈব মতবাদের ধারণাকে গ্রহণ করেননি, "জীবের যা ধর্ম অর্থাৎ স্বাধীন, সুষম ও বৈচিত্রপূর্ণ বিকাশ — তার অবকাশ রাষ্ট্রের মধ্যে অনুপস্থিত।" তাঁর মতে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বিশেষ নিয়ন্ত্রণী শক্তি যা কাজ করে যান্ত্রিকভাবে এবং যার আচরণ স্থূল, নিষ্প্রাণ ও নিষ্করণ। 'The Ideal of Human Unity' গ্রন্থে তিনি বলেছেন,

" . . . . . the state is not an organism ; it is a machinery, and it works like a machine, without tact, taste, delicacy or intuition. It tries to manufacture, but what humanity is here to do is to grow and create." এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ব্রিটিশ চিন্তাবিদ হবহাউসের (L.T.Hobhouse) সঙ্গে অরবিন্দের চিন্তার মিল লক্ষ্য করা যায় যিনি বলেছিলেন, "State is a clumsy machine."

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ চায় চিন্তার স্বাধীনতা, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনের বিকাশ ও তার সৃষ্টিশীল কর্মোদ্যমের উপযুক্ত পরিবেশ। কিন্তু রাষ্ট্র তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন ব্যক্তির উন্নতিই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু রাষ্ট্র একটি বিশেষ দর্শন বা আদর্শ যা একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক, তা সাধারণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শের উপযোগীতা থাকলেও তা বহুক্ষেত্রে ব্যক্তির চিন্তা ও স্বাধীনতায় অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায়। অরবিন্দের মতে বৈচিত্র্যের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। তাই সবকিছুকে একই ছাঁচে গড়ার কল্পনা প্রকৃতি বিরোধী। তবে প্রকৃতি বিভেদের মধ্যে সংহতি সাধনও করে। বহু ও বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য আনে। অরবিন্দ ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন, কারণ ঐক্য ছাড়া স্থায়িত্ব, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা থাকেনা।

একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। পার্থিব অগ্রগতির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। ভারতবর্ষের সামনে মূল ও বৃহত্তর অভীষ্ট হ'ল তার আধ্যাত্মিক বিকাশ ও উন্নতি।

আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রশ্নটি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের স্বার্থের সঙ্গেই জড়িত নয়, সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণেরও পক্ষে তা অতি প্রয়োজনীয়। কারণ আধুনিক বিশ্ব পার্থিব উন্নয়ণ ও দৈনন্দিন সুখস্বাচ্ছন্দ্য আহরণের তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে যাবতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং এই অবনয়ণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আধুনিক সভ্যতার ব্যর্থতার কারণ। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদের বলে বলীয়ান হয়ে সারা পৃথিবীকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিতে পারে এবং প্রকৃত উন্নতির পথ প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষকে যদি এই দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে সর্বাগ্রে তার প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এই জন্যই শ্রী অরবিন্দ দ্বিধাহীনভাবে দাবি করেছিলেন ভারতবর্ষের জন্য পূর্ণ রাজনৈতিক স্বরাজ। তিনি বলেছিলেন —

" . . . . . to strive for anything less than a strong and glorious freedom would be to insult the greatness of our past and the magnificient possibilities of our future."

তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অরবিন্দ চরম লক্ষ্য হিসাবে দেখেননি। রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ তাঁর কাছে ছিল আরও বৃহত্তর লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটি উপায় মাত্র এবং এই বৃহত্তর লক্ষ্য হ'ল ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার হৃত গৌরব ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা। প্রকৃত পক্ষে 'স্বরাজ' বলতে তিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বোঝাননি। স্বরাজের মধ্য দিয়ে অরবিন্দ ভারতের সনাতন ভাবধারা ও রাজনীতিতে বৈদান্তিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। তাঁর মতে দেশপ্রেম ও আত্মদানের মাধ্যমেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর কাছে দেশমাতৃকা। দেশের মুক্তিসাধনা তাঁর কাছে যজ্ঞের ন্যায় আর সেই যজ্ঞের আরাধ্যা হলেন দেশমাতৃকা। আত্মাহুতির মাধ্যমে অরবিন্দ দেশমাতৃকার মুক্তি কামনা করেছিলেন। আর সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কল্পনা করেছিলেন এমন এক উন্নত মানবগোষ্ঠীর যার মাধমে ভারতের সনাতন অন্তরাত্মার পুনরুজ্জীবন ঘঠবে।

শ্রী অরবিন্দের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় ঘটেছিল। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের ঐক্যের আকাঙ্খা ও স্বদেশপ্রেমের আবেগ প্রবল হয়। সমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বার্ক, মাৎসিনী, মিল প্রমুখের চিন্তাধারায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অরবিন্দও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। মাৎসিনী জাতীয়তাবাদের এক নৈতিক ও বিশ্বজনীন স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন যা অরবিন্দকে আকৃষ্ট করেছিল। জাতীয়তাবাদকে পর্যালোচনা করার সমকালীন যান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পবিত্র দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের আবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন অরবিন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তা দ্বারাও বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অরবিন্দ, তাঁর মতে দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করা বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান। তাঁর ভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

শ্রী অরবিন্দ আদর্শ মানবসমাজের যে চিত্র কল্পনা করেছেন সেখানে রাজারাজড়া, যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য থাকবেনা। প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের সমানাধিকার। "স্বাধীন সমবায়ী সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষ সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় যূথবদ্ধতা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও মুক্তির আস্বাদ পাবে।" তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এক সমাজের কথা ভেবেছেন যা সকলের জীবনকেই করে তুলবে সুন্দর ও সার্থক।

আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্গে কোথাও কোথাও শ্রী অরবিন্দের রাষ্ট্রপচিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। হেগেল প্রমুখ জার্মান আদর্শবাদীরা অরবিন্দের মতই অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস করতেন। অরবিন্দ বিশ্বাতীত দিব্য আধ্যাত্মিক সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হেগেলের মতই তিনি জাতির অন্তরাত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু জার্মান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে রাষ্ট্র থেকেই মানুষের অধিকার সৃষ্টি। ইংরেজ আদর্শবাদীগণও যেমন গ্রীণ, ব্রাডলে, বোসানকোয়েত — রাষ্ট্রশক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অরবিন্দের ভাষায় রাষ্ট্র হ'ল একটি নিয়ন্ত্রণী শক্তি যা কৌশল ও কোমলতাহীন এক যন্ত্রমাত্র। গ্রীক আদর্শবাদী প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সঙ্গেও অরবিন্দের রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে রাষ্ট্রের স্থান ব্যক্তির উপরে। কিন্তু অরবিন্দের মতে ব্যক্তিই প্রধান, ব্যক্তির আত্মিক উন্নতিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

অরবিন্দের মতে প্রাচীন সমাজ রাষ্ট্রদ্বারা শাসিত হ'ত না। কিন্তু কালক্রমে রাষ্ট্রের অধীন সরকারের হাতে যখন শাসনক্ষমতা এল তখন থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসকদের দাপটে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত হতে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র থেকেই গণতান্ত্রিক অধিকারের চেতনা জন্মলাভ করে এবং মানুষ নিজের বিবেক ও প্রবণতা অনুযায়ী নিজের মত প্রকাশ করতে চায়। এইভাবেই গড়ে ওঠে তার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা। সেই স্বাধীনতা তাই অবাধ হওয়া প্রয়োজন, আবার একই সঙ্গে সেই যুক্তিবোধ গড়ে ওঠা প্রয়োজন যা অপরের অনুরূপ স্বাধীনতা ও মর্যাদার অধিকারকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু এই যুক্তিবোধ সকল মানুষের মনে যথাযথ বিকশিত না হলে লোকে সংকীর্ণ স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়। অপরের সঙ্গে সুসমঞ্জস সম্পর্ক গড়ে না তুলে বিবাদ বিরোধে লিপ্ত হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই সংকট, যার পরিণতি সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতা— তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়, শ্রী অরবিন্দের মতে, উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার। এই সর্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মনে সঠিক যুক্তিবোধের উন্মেষ ঘটাতে হবে।

৪০.৬ শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাচিন্তা

'A System of National Education' গ্রন্থে শ্রী অরবিন্দ তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে মৌলিক চিন্তাভাবনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাঁর মতে মানুষ সকল শিক্ষণীয় বিষয়ই অন্তরে ধারণ করে থাকে। শিক্ষার ভূমিকা হ'ল বহির্জগতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর অন্তর্লোকের মিলন ঘটিয়ে দেওয়া। আর শিক্ষকের কাজ হ'ল শিক্ষার্থীর প্রবণতা

অনুযায়ী তার জ্ঞানার্জনের প্রয়াসকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে শিক্ষক শুধুই একজন পথপ্রদর্শক। খবরদারি করা তাঁর কাজ নয়।

অরবিন্দ বলেছেন, "the mind has to be consulted in its own growth." প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব মানসিক বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা ও প্রবণতা থাকে যার সন্ধান শিক্ষকের থাকা অবশ্যকর্তব্য। শিক্ষক বা অভিভাবক যদি শিক্ষার্থীর রুচি ও প্রবণতাকে উপেক্ষা করে তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন আগে থেকেই নির্ধারণ করে দেন তবে তার ফল হবে বিষময়। অরবিন্দের মতে, "Everyone has in him something divine, something his own . . . . . the chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself which is best and make it perfect for a noble use."

শ্রীঅরবিন্দ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রাধান্য দিলেও তার সংকট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা মানুষের ইচ্ছা, প্রবণতা, আবেগ ইত্যাদির প্রকাশ ও বিকাশ সম্ভব করে তোলে। তাই স্বাধীনতা হওয়া উচিত অবাধ। কিন্তু একই সঙ্গে অপরের অনুরূপ স্বাধীনতা ও অধিকারকেও সমান মর্যাদা দিতে হবে।

সঠিক যুক্তিবোধ যদি বিকশিত না হয় তাহলে ব্যক্তি সংকীর্ণ স্বার্থ দ্বারা চালিত হয় এবং অপরের সঙ্গে সমন্বয়ের পরিবর্তে তার উপর নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দিয়ে বিরোধে লিপ্ত হয়। অরবিন্দ বলছেন এর ফলে গণতন্ত্রের নামে অসংখ্য অজ্ঞ অভাগা মানুষের উপর শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অপর পক্ষে পদানত মানুষ যথার্থ গণতন্ত্রের দাবীতে সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য ঐ শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এর পরিণতি হ'ল এক প্রতিযোগিতামূলক সমাজ সম্পর্ক যা অরবিন্দের মতে "not a rational order of society."

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের এই সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে অরবিন্দ সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের কথা বলেছেন যার প্রধান লক্ষ্য হ'ল মানুষের মনে যুক্তি বোধের সঞ্চার। এই শিক্ষাব্যবস্থার কর্মসূচী হবে ত্রিবিধঃ

(১) কোন কিছুকে বিচার করতে হলে কেমনভাবে দেখতে ও জানতে হয় তা বোঝানো;

(২) সঠিক ও অর্থবহ প্রণালীতে চিন্তা করতে শেখানো; এবং

(৩) চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানকে যাতে সবাই নিজের ও অপরের কল্যাণে নিয়োগ করতে পারে তাদের সেইভাবে তৈরি করা।

অরবিন্দের মতে শিক্ষার্থীর মানসিক পশ্চাৎপট বিবেচনা করা প্রয়োজন। মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয় পূর্বকৃত কর্মকলের ভিত্তিতে। বংশ, জাতি, দেশ, কাল ও পরিবেশ দ্বারা মনুষ্যচরিত্র প্রভাবিত হয়। নিজ প্রকৃতি সহ আত্মা মাতৃজঠরে দেহ ধারণ করে। পিতামাতার সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণের পর কালক্রমে মানুষ পরিবার, জাতি ও সমাজের গুনাগুণ অর্জন করে। সুতরাং শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের আনুপূর্বিক প্রভাব, পরিবেশ এবং তার অতীত সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা দরকার।

শ্রী অরবিন্দ মনকে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন — চিত্ত, মানস, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা। চিত্ত হ'ল স্মৃতির

ধারক ও বাহক। সেখানে সঞ্চিত নিষ্ক্রিয় স্মৃতি থেকে সক্রিয় স্মৃতি উৎপন্ন হয়। নিষ্ক্রিয় স্মৃতি অতীতের ছাপমাত্র। মানুষের জীবনে তার প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই যদিও সেই অচেতন ছাপ মুছে ফেলা সম্ভব নয়। সক্রিয় স্মৃতি নিরন্তর মনকে বিকশিত করে।

দ্বিতীয় স্তর হ'ল মানস। পঞ্চেন্দ্রিয় হ'ল মানসের ভিত্তি। শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়ে শেখানোর সময় যদি সেই বস্তুটি সরাসরি তার সামনে প্রদর্শন করা যায় তবে সহজেই সেই বিষয়টি তার মনে গেঁথে যায়। মানসিক শক্তি মানসস্তর প্রসূত এবং সেকারণেই মানসের প্রতিনিয়ত পরিশীলন প্রয়োজন। এ ব্যাপারে অরবিন্দ যোগসাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ছোটবেলা থেকেই যোগাভ্যাসের প্রয়োজণীয়তার কথা বলেছেন।

মনের তৃতীয় স্তর বুদ্ধি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এই স্তরে সুসংবদ্ধ হয়। বৌদ্ধিক স্তরের ক্রিয়াগুলি কখনও সৃজনশীল ও সামঞ্জস্যবিধানকারী আবার কখনও অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণমূলক। কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্যবোধ, যুক্তিবোধ প্রভৃতি এই স্তর থেকেই উৎসারিত হয়। একজন শিক্ষকের মূল কর্তব্য হ'ল শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তির বিকাশে সহায়তা করা। প্রথমে তার দৃষ্টি বস্তুর প্রতি আকর্ষণ করে ধীরে ধীরে মননক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করা প্রয়োজন। তা নাহলে অধীত জ্ঞান বোঝাস্বরুপ হয়ে দাঁড়ায়। প্রায়োগিকে দৃষ্টিতে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে নায়শাস্ত্র ও সৌন্দর্যতত্ত্বের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মনের শেষ স্তরকে যা হল স্বজ্ঞা (intuition)। বুদ্ধির মত স্বজ্ঞাত বিস্তৃতিলাভের সুযোগ নেই। প্রতিভাবান মানুষের মেধা ও মনীষার ভিত্তি হল স্বজ্ঞা। শিক্ষককে সহানুভূতি সম্পন্ন সংবেদনশীল মন নিয়ে শিক্ষার্থীর সুপ্ত মন ও প্রবণতাকে জানার চেষ্টা করতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ তত্ত্বগত শিক্ষার পাশাপাশি ধ্যান, উপাসনা ও অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি নির্বাচন দেশের মাটির দিকে লক্ষ্য রেখেই হওয়া উচিত। শিশুকে ছ'বছর বয়সের আগে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করাই ভাল, কারণ তার আগে শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠন উপযুক্ত হয়না। তিনি শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার সপক্ষে মত প্রদান করেছেন। শিক্ষার সঠিক প্রণালী হল ছাত্রদের সহজাত আবেগ, মেলামেশার অভ্যাস এবং সহজাত প্রকৃতি ও প্রবণতা বুঝে তাদের উপযুক্ত পথে পরিচালনা করা। শিক্ষার্থীর সহজাত নীতিবোধ জাগ্রত করা বিশেষ প্রয়োজন, যদিও অরবিন্দ জানতেন পাঠ্যপুস্তক বা সিলেবাসের সাহায্যে সেটা সম্ভব নয়। অসার বক্তৃতা নয়, শিক্ষার্থীর সামনে রাখতে হবে অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্র। শিক্ষকের চরিত্রে জ্ঞানতৃষ্ণা, দেশাত্মবোধ, মহানুভবতা, আত্মত্যাগ, সততা ও সাহসিকতা থাকা প্রয়োজন যা সহজেই ছাত্রদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে।

৪০.৭ সারাংশ

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শ্রী অরবিন্দ আধুনিক চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিলেন। তিনি বৈদান্তিক ভাবধারার সঙ্গে পশ্চিমী রাষ্ট্রদর্শনকে সংমিশ্রিত করেন। ইতিহাস, সমাজ, দর্শন ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তিনি স্বচ্ছ, বাস্তব ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে আলোচনা করেছেন।

শৈশব অবস্থাতেই অরবিন্দ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রবাসজীবনের কালপর্ব প্রায় চোদ্দ বছর। বিদেশে থাকাকালীনই অরবিন্দ রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। Lotus and Dagger নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন তিনি।

দেশে ফিরে অরবিন্দ কিছুদিন বরোদায় অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলায় তাঁর প্রথম গুপ্তসমিতি গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কংগ্রেসের তোষণনীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন তিনি। মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়ের মত অরবিন্দ বাংলায় চরমপন্থী নীতি ও কর্মধারা প্রচার করতে শুরু করেন। অরবিন্দ, বিপিন চন্দ্র পাল এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মিলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী কংগ্রেসকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে বিকল্প চরমপন্থী রাজনৈতিক কর্মসূচী উদ্ভাবন করলেন। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে অরবিন্দ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বিপিনচন্দ্র পাল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এর তত্ত্ব প্রচার করেন।

প্রথমদিকে অরবিন্দ ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ও বন্দে মাতরম্' মন্ত্র তাঁকে উজ্জীবীত করেছিল। কিন্তু হঠাৎই তিনি রাজনীতির মঞ্চ থেকে অন্তরালে চলে গেলেন এবং ক্রমে যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিকতার জীবনে আশ্রয় নিলেন।

অরবিন্দের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় পবিত্র দেশানুরাগ ও আধ্যাত্মিকতার আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। জাতিকে তিনি দিব্য অভিব্যক্তিরূপে দেখেছেন।

ভারতবর্ষের জন্য পূর্ণ রাজনৈতিক স্বরাজ দাবী করেছিলেন অরবিন্দ আর স্বরাজের মাধ্যমে তিনি ভারতের সনাতন ভাবধারা ও বৈদান্তিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দ রাজনীতির আধ্যাত্মিক রূপায়ণ কামনা করতেন।

অরবিন্দ আধুনিক ধনতন্ত্রকে সমর্থন করেননি। আবার সমাজতন্ত্রকেও তিনি মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষমতাবাদের রাজত্ব হিসেবে দেখেছেন। সমাজজীবনে অর্থনৈতিক সমতা ও নিরাপত্তার গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেছেন।

অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন জৈব অস্তিত্বই মানুষের জীবনের একমাত্র কাম্য হতে পারে না, তাকে আয়ত্বে এনে অতিক্রম করা এবং উন্নততর অতিমানষের পর্যায়ে উন্নীত করাতেই মানবজীবনের সার্থকতা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ধ্যান ও যোগসাধনার উপর জোর দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর আদর্শে পন্ডিচেরীতে প্রতিষ্ঠিত অরবিন্দ আশ্রমও হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও যোগসাধনার কেন্দ্রস্বরূপ।

৪০.৮ অনুশীলণী

১। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শ্রী অরবিন্দের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। চরমপন্থী আন্দোলনের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিতে শ্রী অরবিন্দের ভূমিকার মূল্যায়ণ করুন।

৩। অরবিন্দের 'আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ' ব্যাখ্যা করুন। এই জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৪। শ্রী অরবিন্দের চিন্তায় রাষ্ট্র ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করুন।

৫। শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাভাবনার উপর আলোকপাত করুন।

৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (দ্বিতীয় খন্ড) ১৯৯০

২। দেবাশিস চক্রবর্তী : ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা, ১৯৯৭

৩। Amal Kumar Mukhopadhyay : The Bengali Intellectual Tradition, 1979.

৪। V.P. Verma : Modern Indian Political Thought, 1998

৫। A. Appadorai : Indian Political Thinking Through the Ages, 1992.

একক ৪১ □ বাল গঙ্গাধর তিলক

গঠন

৪১.০ উদ্দেশ্য

৪১.১ প্রস্তাবনা

৪১.২ উদারনীতিবাদের (Liberalism) মূলসূত্রগুলি

৪১.২.১ নরমপন্থী ও চরমপন্থী (Moderates and Extremists) : মৌলিক পার্থক্য

৪১.৩ তিলক : জীবন ও কর্ম।

৪১.৪ তিলকের সামাজিক চিন্তা ভাবনা।

৪১.৪.১ সমাজ সংস্কার

৪১.৪.২ সমাজ সংস্কার স্থগিত রাখা প্রসঙ্গে

৪১.৪.৩ আইনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার

৪১.৪.৪ জাতীয় শিক্ষা

৪১.৫ তিলকের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা

৪১.৫.১ স্বরাজ

৪১.৫.২ জাতীয়তাবাদ

৪১.৫.৩ চরমপন্থা (Extremism)

৪১.৫.৪ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance)

৪১.৬ সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

৪১.৭ সারাংশ

৪১.৮ অনুশীলনী

৪১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪১.০ উদ্দেশ্য

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং চিন্তাভাবনা সম্পর্কে লেখা হয়েছে। এই একক পাঠশেষে আপনি যা জানতে পারবেন তা হ'ল :

- অসামান্য দেশপ্রেমী তিলকের গৌরবময় জীবন ও কর্মের কথা।
- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অসাধারণ অবদানের কাহিনী।
- তাঁর সমাজসংস্কার ও জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা।
- তাঁর ইতিহাসখ্যাত স্বরাজ সম্পর্কিত তত্ত্ব।
- জাতীয়তাবাদ, চরমপন্থা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বিষয়ে তাঁর মূল্যবান রাজনৈতিক চিন্তাধারা।

৪১.১ প্রস্তাবনা

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতারা দল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। ফলে কংগ্রেসের সেই আদিযুগে পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা ও রীতিনীতি দলকে প্রভাবিত করেছিল। সেই কারণেই উদারনীতিবাদ (Liberalism) হয়ে ওঠে কংগ্রেসের ভাবাদর্শ।

৪১.২ উদারনীতিবাদের মূলসূত্রগুলি

তখনকার কংগ্রেসী নেতারা উদারনীতিবাদের নিম্নলিখিত মূল সূত্রগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন :

(ক) মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাস,

(খ) স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা,

(গ) আইনের অনুশাসন (Rule of Law) ,

(ঘ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা; সংস্কৃতি নির্বিশেষে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের সাম্য,

(ঙ) ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)।

কংগ্রেসের উদারনীতিবাদী নেতাগণ বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ভারতে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছে। ব্রিটিশ উদারনীতিবাদ অনুসরণ করে তাঁরা রাষ্ট্র ও সমাজের আকস্মিক পরিবর্তন নয়, ধীরে ধীরে বিবর্তনভিত্তিক উন্নতিতে বিশ্বাস করতেন। এই কারণে তাঁরা সাংবিধানিক পদ্ধতি (Constitutional methods) অনুযায়ী সব পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। উদারনীতিবাদী নেতাগণ ধর্মনিরপেক্ষতায় (Secularism) বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করার পক্ষপাতী ছিলেন। জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে সচেতন এই নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন, রাজনীতির স্বার্থে ধর্মীয় পার্থক্যকে ব্যবহার করলে জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হবে। ইতিহাসে এঁরাই 'নরমপন্থী' নামে পরিচিত।

৪১.২.১ নরমপন্থী ও চরমপন্থী মৌলিক পার্থক্য

নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত ভারতীয়গণ — যাঁরা চরমপন্থী নামে পরিচিত — নরমপন্থীদের সমস্ত ধ্যান ধারণা বাতিল করে দিলেন। আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি — উভয়দিক থেকেই নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের সাংবিধানিক পদ্ধতি (Constitutional methods) এবং বিবর্তনমূলক কৌশল (evolutionary strategy) সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। সরকারের প্রতি আবেদন নিবেদন এবং আইন মেনে আন্দোলনের নীতি যে ফলপ্রসূ হয় না তা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা চরমপন্থা অবলম্বন করে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপসৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা হিন্দু সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ থেকে কিছু আচার-অনুষ্ঠান বাছাই করে নিয়ে আধুনিক কালে পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিলক প্রবর্তিত শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসব এবং গণপতি উৎসবকে গণ-উৎসবে পরিণত করার কথা বলা যায়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এইসব উৎসবের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের আবেগকে জাগিয়ে তুলে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত গঠন করা।

এইভাবে চরমপন্থীরা জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন পথ এবং এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান দিয়েছিলেন। প্রধানতঃ এঁদের প্রয়াসের ফলেই ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রকৃতির পুণর্মূল্যায়ন করে তার চরম ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জনসাধারণ গভীরভাবে ভাবতে শুরু করলেন।

কিংবদন্তী ত্রয়ী, লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল — "লাল বাল পাল" নামে যাঁরা জনসমক্ষে অধিক পরিচিত—তরুণ চরমপন্থীদের নেতা ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও আন্দোলন গঠনে নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন। আমরা এখানে বাল গঙ্গাধর তিলকের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তাঁর অবদানের বিষয়ে আলোচনা করব।

৪১.৩ তিলক : জীবন ও কর্ম

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ১৮৫৬ সালের ২৩ শে জুলাই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার শিক্ষক-পিতার প্রভাবে তিনি বাল্যকাল থেকেই সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ছিলেন। হয়ত সেই কারণেই তিলক অল্প বয়স থেকেই ভারত ও তার জনগণের সুপ্রাচীন ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সবশেষে মারাঠা রাজ্যই ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেজন্য তিলক বাল্যকাল থেকেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হয়েছিলেন।

তিলকের দশবছর বয়সে তাঁর বাবা পুণে শহরে বদলী হয়ে যান। ফলে তিলক উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। ১৮৭৬ সালে গ্র্যাজুয়েট হবার পর তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু আইনজীবীর পেশা গ্রহণ না করে তিনি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তিনি পুণে শহরে New English School স্থাপন করেন। এরপর তিলক 'মারাঠী' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক ও 'কেশরী' নামে একটি মারাঠী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। দুটিই প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার চার বছর আগে। এই দুটি সাপ্তাহিকের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে তিলক মহারাষ্ট্র তথা পশ্চিম ভারতের নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন।

নব্বইয়ের দশকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনগুলিতে তিলক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। ১৮৯১-এর কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতীয়দের স্বার্থের অনুকূলে তিলক অস্ত্র আইন (Arms Act) সংশোধন এবং সামরিক বাহিনীতে আরও বেশী সংখ্যায় ভারতীয়ের প্রবেশের দাবী করেন। তিলক তাঁর দুটি সাপ্তাহিকে যে সব বিষয় নিয়ে লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সেগুলি হ'ল — কমিশনার ক্রফোর্ড - এর দুর্নীতিগ্রস্থ প্রশাসন, অন্যায্য ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ব্রিটিশ সরকারের "বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর" ("Divide and Rule") নীতি, মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি। অনেকটা তিলকের চেষ্টাতেই মহারাষ্ট্রে গণপতি ও শিবাজী উৎসব নতুন করে শুরু হয়। এর ফলে ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে জনগণের মনে গর্বের সঞ্চার হয় এবং তাঁরা নতুন উৎসাহে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন।

১৮৯৭ সালের জুলাই মাসে "কেশরী" পত্রিকায় রাষ্ট্রদ্রোহী লেখা প্রকাশের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার

এক বিচারের প্রহসন করে। তিলককে আঠারো মাসের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়।

১৮৯৮ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের বীর নেতা তিলক অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এই সময়ে ত্রয়ী নেতা 'লাল বাল পাল' বাংলা ভাগ রদ করার জন্য এক চার দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করেন — স্বরাজ, স্বদেশী, বহিষ্কার (বয়কট) এবং জাতীয় শিক্ষা। তিলকের সমগ্র দেশব্যাপী ঝটিকা সফরের সময় তাঁর সেই ইতিহাস খ্যাত স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে, "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং তা আমি অর্জন করবই।" ("Swaraj is my birthright and I will have it.")

বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' আন্দোলন অনুসরণ করার জন্য তিলক কংগ্রেসকে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। ফলে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে তিলককে গ্রেপ্তার করে এক হাজার টাকা জরিমানা এবং ছয় বৎসরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

মান্দালয়ে কারারুদ্ধ অবস্থায় তিলক তার প্রখ্যাত 'গীতা রহস্য' রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি গীতার ব্যাখ্যা করেন এবং জনগণকে কর্মযোগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিঃস্বার্থ সামাজসেবায় ব্রতী হতে আহ্বান করেন।

১৯১৬ সালে তিলক আয়ারল্যান্ডের হোমরুল আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে "হোমরুল লীগ" প্রতিষ্ঠা করেন। মুশলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬) সম্পাদনেও তিলক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

১৯১৮-১৯ সালে ইংল্যান্ডে অবস্থানের সময়ে তিলক ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের স্বপক্ষে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটিশ শ্রমিকদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংস্কার বিল সংক্রান্ত যৌথ সিলেক্ট কমিটির সামনে তিলক তাঁর "হোমরুল লীগের" পক্ষ থেকে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্যারিস শান্তি সম্মেলনে (১৯১৯) যোগদান করতে তিলক ব্যর্থ হন, কারণ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফ্রান্সে যাবার পাশপোর্ট দিতে অস্বীকার করে। অবশ্য তিনি সম্মেলনের সভাপতির নিকট প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে এই যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন যে স্বনিয়ন্ত্রিত ভারত এশিয়া মহাদেশে শান্তির দুর্গ হিসাবে কাজ করতে পারবে। স্বাধীনতা অর্জনের ঠিক পরেই জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে নেতৃত্বদান থেকে আরম্ভ করে বিশ্বশান্তি অর্জনের নানা ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা তাঁর এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্যই প্রমাণ করে।

১৯১৯ সালে তিলক যখন ইংল্যান্ডে তখনই পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে নৃশংস গণ-হত্যাকান্ড ঘটে যায়। পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকারের নানাবিধ অত্যাচার চলছিলই। এবার জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও ক্রোধে সমগ্র দেশ গর্জে ওঠে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রতিবাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাওয়া 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় নেতা হিসাবে গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে। দেশে ফিরে তিলক ১৯১৯ সালের অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধীর আসন্ন অসহযোগ আন্দোলনকে স্বাগত জানালেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ব্রিটেনের অর্থনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে "স্বদেশী" আন্দোলন গান্ধীরও আগে তিলক সমর্থন করেছিলেন। ১৯২০

সালের ১লা আগস্ট তিলকের মৃত্যুতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে একটি যুগের অবসান ঘটে। গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয় পরবর্তী যুগ।

I. M. Reisner & N.M.Goldberg তিলকের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন, "তিলক তাঁর দেশের জাতীয় স্বাধীনতা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন। সংগত কারণেই তিনি গৌরব অর্জন করেছেন এবং ভারতের প্রথম জনবরেণ্য নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন ("A dedicated fighter for his country's national freedom and democratic rights of the people that he was, Tilak justly gained prestige and was acknowledged the first popular leader of India")।

অনুশীলনী - ১

(ক) উদারনীতিবাদের মূলসূত্রগুলির উল্লেখ করুন।

(খ) নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মৌলিক পার্থক্য কি কি ?

(গ) তিলকের জীবন ও কর্ম সংক্ষেপে পর্যালোচনা করুন।

৪১.৪ তিলকের সামাজিক চিন্তা-ভাবনা

তিলকের সামাজিক চিন্তা-ভাবনাকে আমরা দুটি অংশে ভাগ করতে পারি — সমাজ সংস্কার ও জাতীয় শিক্ষা।

৪১.৪.১ সমাজ সংস্কার

তিলকের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে ধ্যানধারণা অন্যান্য চিন্তাবিদদের থেকে আলাদা ছিল। এই সম্পর্কে তিলকের চিন্তা-ভাবনা সঠিকভাবে অনুধাবন না করলে তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে।

তিলক সমাজ সংস্কারের মোটেই বিরোধী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আচার-অনুষ্ঠান সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হয়। বস্তুতঃ তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তানুযায়ী গোঁড়ামীকে (Orthodoxy) প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর সমাজ-সংস্কার তত্ত্ব উদারনৈতিক সংস্কারবাদীদের (liberal reformer) থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তিলক জনগণের ঐতিহ্য অনুসারে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমবিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। অতীতের সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ করে অকস্মাৎ যে পরিবর্তন আসে তা কখনই স্থায়ী হতে পারে না, বরং তা সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তিলক মনে করতেন, আমাদের ঐতিহ্যের গ্রহণীয় উপাদানগুলি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, তিলক কখনই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকে সমর্থন করেন নি। পাশ্চাত্যের সবকিছুই ভাল—এইরকম একপেশে ধারণা তিনি পছন্দ করতেন না। আসলে তিলক ছিলেন মুক্তমন চিন্তাবিদ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। তাঁর জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা এই বিষয়ে একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত।

৪১.৪.২ সমাজসংস্কার স্থগিত রাখা প্রসঙ্গে

তিলক মূলতঃ তিনটি কারণে সমাজসংস্কার স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। প্রথমতঃ তিনি মনে করতেন ভারতীয় সমাজের ত্রুটিগুলির অধিকাংশই বিদেশী শাসনের অভিশাপের ফল। সুতরাং সমাজসংস্কার থেকেও অগ্রাধিকার পাবে দেশের স্বরাজ।

দ্বিতীয়তঃ সমাজ সংস্কার সাধনের উদ্যোগ জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সাফল্যের জন্য জাতীয় ঐক্য একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ যথাসময়ে আপনিই সমাজের পরিবর্তন আসবেই। অযথা ব্যস্ততা দেখালে সামাজিক সুস্থিতি বিঘ্নিত হয়।

৪১.৪.৩ আইনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার

তিলক প্রধানতঃ দুটি কারণে আইনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের বিপক্ষে ছিলেন। প্রথমতঃ দীর্ঘমেয়াদী স্বতঃস্ফূর্ত সমাজসংস্কার স্থায়ী ও কল্যাণকর হয়। আইনের মাধ্যমে সমাজসংস্কার উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, ফলে অযথা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ আইনের দ্বারা সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তিকে আমাদের দেশের সামাজিক—রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে আহ্বান করা।

৪১.৪.৪ জাতীয় শিক্ষা

তিলক প্রথম জীবনে শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিক মঙ্গল সাধনের দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি পুণে শহরে ১৮৮০ সালে New English School প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পরবর্তীকালে Deccan Education Society এবং বিখ্যাত Fergusson College স্থাপন করেন। তিলকসহ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীগণ ভারতে ইংরেজ প্রবর্তিত পশ্চিমী-ঘেঁষা (Westernised) শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, এই শিক্ষাব্যবস্থা এমন এক শ্রেণীর জন্ম দেয় যারা রক্তের সূত্রে ভারতীয়, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির দিক থেকে বৃটিশকুলের ঘনিষ্ঠ। তিলক এবং সমমনস্ক চিন্তা-নায়কগণ চেয়েছিলেন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা জনসাধারণের মনে তাঁদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্ভ্রম গড়ে তুলুক। এই কারণে তাঁরা 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা' (National Education System) প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন।

তাঁদের ভাবনা ছিল, 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায়' স্কুল এবং কলেজগুলিকে কেবলমাত্র ভারতীয়রাই পরিচালনা করবে। ধর্মীয় শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে। কারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর ধর্মের একটা বিশেষ প্রভাব আছে। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি শৌর্য-বীর্যশালী হবার সঙ্গে সঙ্গে তার নৈতিক চরিত্রেরও বিকাশ হয়। অবশ্য তিলকের মতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা এবং বিজ্ঞান-কারিগরী শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। তার সাহায্যে তরুণ-তরুণীরা বর্তমান যুগ ও জগতের চাহিদার উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে।

অনুশীলনী - ২

(ক) তিলকের সামাজিক চিন্তা-ভাবনা বিষয়ে একটি নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

(খ) তিলকের সমাজ সংস্কার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

(গ) সমাজ সংস্কার সম্পর্কে তিলকের তত্ত্ব কি ছিল?

(ঘ) তিলক কেন সমাজ সংস্কার স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন?

(ঙ) তিলক কেন আইনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের বিরোধী ছিলেন।

(চ) তিলকের জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা পর্যালোচনা করুন।

৪১.৫ তিলকের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা

কিংবদন্তী ত্রয়ী 'লাল-বাল-পাল' ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই তিন চিন্তানায়ক আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা এবং রাজনৈতিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে (Political ideas and political methods of modern India) মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। বিবেকানন্দ, তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখ চিন্তানায়কগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দর্শন ও সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা আগেই বুঝেছিলেন, দ্রুত পরিবর্তনের যুগে পাশ্চাত্যের আধুনিক ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করলে ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। এই প্রসঙ্গে Dennis Dalton বলেছেন, "এই বিশেষ ভারতীয় চিন্তাবিদদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যের সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং একই সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের দাবী অনুযায়ী নতুন ধ্যান ধারণা প্রবর্তন করা।" ("The purpose of these particular Indian thinkers was at once to preserve continuity with their own tradition and to introduce conceptual innovations demanded by a society in the midst of rapid transition.")।

তিলকের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা এখানে সংক্ষেপে উপস্থিত করা হ'ল।

৪১.৫.১ স্বরাজ্য বা স্বরাজ

(তিলক 'স্বরাজ্য' শব্দটির ব্যবহার করেছেন, কারণ সংস্কৃত শব্দ 'স্বরাজ' অর্থে মারাঠী ভাষায় 'স্বরাজ্য' ব্যবহার করা হয়।)

অদ্বৈতবেদান্তবাদী তিলক বিশ্বাস করতেন, মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া। ভাগবত গীতার শিক্ষানুযায়ী এই মিলিত হওয়া সম্ভব একমাত্র কর্মযোগের মাধ্যমে, অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য নিঃস্বার্থ ও নিষ্কামভাবে কর্ম করবে। স্বরাজ অর্জনের আন্দোলন এই কর্মযোগেরই অঙ্গ।

লক্ষণীয়, বিবেকানন্দ ও গান্ধীও তিলকের মত গীতার কর্মযোগ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনসেবাব্রত গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিলক যে স্বরাজ আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা পরবর্তীকালে গান্ধীর আমলে এক বিশাল জনজোয়ারে পরিণত হয়।